আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮

প্রধান সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ

সম্পাদক : মণীশ, আপতার, জয়দেব

কোষাধ্যক্ষ : জয়দীপ মুখার্জি

দাম : পঁচিশ টাকা

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : (০৩৩) ২৫৬০-৫১১১

হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : (০৩৩) ২৫৬০-৫১১১

সূচি

সম্পাদকীয়/২

চয়ন :
সুফি মতবাদ ও উদারতা : প্রবীর ঘোষ/৩

প্রবন্ধ :
সাম্যের পথে : অলোক সাগর : মণীশ রায়চৌধুরী/৪
দারিদ্র দূরীকরণ : দিলীপ দাস মণ্ডল/৭
বিজ্ঞানের বিশ্বাস এবং... : অনাবিল সেনগুপ্ত/১০
ভূতের গ্রামে স্টার আনন্দের সঙ্গে টানা তিনদিন : প্রবীর ঘোষ/২৩
মনসার ভর : শংকর ভড়/৫২
বিশ্বাস বনাম আত্মবিশ্বাস : অমরনাথ মুখোপাধ্যায়/৬৫
সেক্যুলারিজম : মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ : যতীন সরকার/৭৩

রিপোর্ট :
১৯ জুন ২০০৩ : দেবু তান্ত্রিকের ভাণ্ডাফোড় : সন্তোষ শর্মা/২৬
হাসপাতালে ভূত/২৯
পেঁয়াজ ভূত নিয়ে গুজব/৩১
ভূত পোষার শাস্তি থেকে যুক্তিবাদীরা দিল মুক্তি : সন্তোষ শর্মা/৩৪
দমদমের শেঠবাগানে ভূত/৪৩
দেবু তান্ত্রিক ও হত্যার ষড়যন্ত্র : প্রবীর ঘোষ : সন্তোষ শর্মা/৪৬

প্রতিবেদন :
কোতুলপুরের সেই স্কুলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি : অলোক সেন/৪০
যুক্তিবাদীসের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে : প্রবীর ঘোষ/৪১

সত্যানুসন্ধান :
ভুতুড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধান কিভাবে করবেন : সন্তোষ শর্মা/৬৯
নিমগাছে ত্রিচক্ষু রহস্য : সন্তোষ শর্মা/৭২

গল্প :
কুউউক : আপতার/৭৭

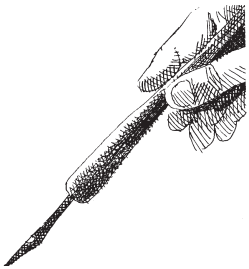

সম্পাদকীয়

মাননীয় মোদীজি, মিডিয়া বলে আপনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমী।

আপনি নাকি সারাক্ষণ ভারতমাতার জয়গান করেন। কিন্তু কোথায় আপনার ভারতমাতা? তার রূপই বা কেমন? তিনি কি কোন মন্দিরের অলীক কল্পনাজাত দেবী? আপামর ভারতবাসী তো আপনার বন্ধু আম্বানি, আদানির মত ধনী নয়। তারা নিতান্তই দীন, হীন। কতজনের তো একবেলা খাবারও জোটে না। তাদের মাতা, ভারতমাতা তাহলে কিভাবে সোনার সিংহাসনে বসা দেবী হতে পারেন?

মা কি কখনো সন্তানের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে? মা তো আসলে ঝাড়খন্ডের কোয়েলি দেবী। আপনার কল্পনার সোনার মোড়া দেবী নয়। তাই তো সে নিজ সন্তানের খিদের জ্বালা সইতে পারেনি। খাদ্যের জন্য রেশন দোকানে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু এ হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ইন্ডিয়া। এখানে এত সহজে মা তার সন্তানের জন্য খাবার পেয়ে যাবে তা কি হয়? রেশনদোকান সাফ জানিয়ে দিল, আধার কার্ড না থাকলে রেশন দেওয়া যাবে না। কোয়েলি দেবী কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এটা বোঝার জন্য রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। কিন্তু অনুনয় বিনয় করলেই তো আর সব 'বেয়াদপি' মেনে নেওয়া যায় না। তাহলে কি আর আপনার 'তাসের দেশে'র নিয়ম টিকবে?

কী আর এমন ক্ষতি হল? একটা শিশু না খেতে পেয়ে মারা গেলে আপনার কিইবা আসে যায়? গোমাতা তো আর মরেনি। আপনার সাধের রামমন্দির তৈরি তো আর আটকে যায়নি। আর এদেশে রোজ এমন কত শিশু মরছে। আমরা তো এভাবেই বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে 'অনবদ্য শতরান' করে ফেলেছি। গর্বে বুক ফুলিয়ে তিরঙ্গটাও কেমন পতপত করে উড়ছে। বুকটা হয়ত একটু বেশিই ফুলিয়েছে। মনে হয়ত ভয় আছে।

পাছে আপনি তিরঙ্গাকেও দেশপ্রেমের প্রমাণ দিতে বলেন। কোয়েলি দেবীর কোল না হয় খালিই হল। তিনি তো আর ভারতমাতা নন।

সুফি মতবাদ ও উদারতা

প্রবীর ঘোষ

সুফিদের উৎপত্তি ইসলাম ধর্ম থেকে। তবে অনেক রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটেছে সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে। ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা নবি হজরত মহম্মদ। তিনি প্রধান তিনটি নীতি ঠিক করে দিয়েছিলেন নামাজ, রোজা ও জিহাদ। 'জিহাদ' হল জোর করে ইসলাম ধর্ম নিতে বিধর্মীদের বাধ্য করা। খ্রিস্টান ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে আজাদির লড়াইতে অংশ নিতে দূর দূর দেশ থেকে হাজার হাজার মুসলিম আসতে থাকে। এইসব জেহাদিদের মধ্য থেকেই কিছু কিছু মুসলিমদের সীমান্তে দুর্গরক্ষার কাজ দেওয়া হয়। এইসব 'রিয়াত' বা চৌকির দায়িত্বে থাকা জেহাদিদের বলা হত 'গাজি'।

এই 'গাজি'রা সুদীর্ঘ কাল ধরে পরিচিত সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে শুকনো রুটি ও বেশি হলে সঙ্গে একটু খেজুর খেয়ে অতি সাধারণ জীবন যাপন করত। পরিধানে থাকত সাদা বস্ত্রের পোশাক। ভোগহীন নিঃসঙ্গ জীবন ছিল বৈচিত্রহীন। ওদের 'রিয়াত' বা চৌকিগুলো এক সময় হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক চিন্তার আশ্রম। ওরা গান-বাজনার মধ্য দিয়ে শান্তি খুঁজে পান। শরীয়া অনুসারে কিন্তু গান-বাজনা নিষিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই 'সুফি' বলে পরিচিত হয়।

সম্ভবত সাদা পোশাক পরিধানের সঙ্গে সুফি নামকরণের সম্পর্ক ছিল। সুফিরা গান গাইতে গাইতে অতি আবেগে ভরগ্রস্তের মত আচরণ করে। এগুলো হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। সুফিয়া শরীয়া বিধানের গোঁড়ামি থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিলেন। ধীরে ধীরে সুফি মতবাদ বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ওদের অনেকেই নবির পথনির্দেশ মানেন না। কোরআন পড়েন না। রোজা, নামাজ প্রভৃতি ত্যাগ করেন। দ্বাদশ শতকে এসে ইমাম গাজ্জালী সুফিবাদকে একটা নতুন রূপ দেন। তাঁর সুফিবাদে ইসলামের কিছু ভুল ধারণা ও আচার বাদ দেন। এবং গাজ্জালীর সুফিবাদই সুফি সম্প্রদায়ের মূলস্রোত হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে তুর্কীরা যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তখন (১২০৬ খ্রিস্টাব্দে) মুসলিম হামলাকারিদের সঙ্গী হিসেবে গাজ্জালীপন্থী সুফিদের ভারতে আগমন ঘটে। সুফিনেতা ইমাম গাজ্জালী ছিলেন গোঁড়া জিহাদি। ভারতে এই সময় বিখ্যাত সুফি দরবেশ নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আমির খসরু, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি, নাসিরুদ্দিন চিরাগ-এর আগমন ঘটে। এরাও ছিলেন জিহাদি।

সাম্যের পথে : অলোক সাগর

মণীশ রায়চৌধুরী

একজন বিদেশী ডিগ্রিধারী IIT অধ্যাপক বলতে আমাদের মনে কী চিত্র ভেসে ওঠে? স্যুট-বুট এবং দামী ফ্রেমের চশমা পড়া একজন অধ্যাপক যিনি গাড়ি করে লেকচার দিতে আসেন।

দেশী এবং বিদেশী কনফারেন্সে যোগ দিতে যান। সেখানে ৩টি শতচ্ছিন্ন কুর্তা ও একটা সাইকেল সম্বল করে একজন টেক্সাসের হিউস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে PhD করা IIT দিল্লীর অধ্যাপক গত ৩০ বছর ধরে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তা অকল্পনীয়।

এরকম বেখাপ্পা লোক রাষ্ট্রযন্ত্রের 'সুশীল গণতান্ত্রিক' মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেন না।

তাই তাকে মধ্যপ্রদেশের ঘোরাডোঙ্গারি বিধানসভা অঞ্চলের প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে নকশাল সন্দেহে আটক করা হয়। তার কাছে ঐ অঞ্চলের ভোটার কার্ড বা অন্য কোন পরিচয়পত্র না পাওয়ায় সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়।

অনোন্যপায় হয়ে মধ্যপ্রদেশের বেতুল ও হোসাঙ্গাবাদ জেলাতে 'মাস্টারজি' নামে পরিচিত অলোক সাগর নিচের প্রকৃত পরিচয় দেন।

RBI এর প্রাক্তন গভর্ণর রঘুরাম রাজন এককালে যার ছাত্র ছিলেন তিনি ৩০ বছর ধরে নিপীড়িত আদিবাসীদের জন্য কাজ করে চলেছেন খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই জনতার চাপে প্রশাসন তাকে ছাড়তে বাধ্য হয়। 'গণতান্ত্রিক' ভারতরাষ্ট্রের কাছে এই ঘটনা নতুন নয়।

পূর্বেও শঙ্কর গুহনিয়োগী, বিনায়ক সেন বা 'বনবাসী চেতনা আশ্রমে'র হিমাংশু কুমার, যারাই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন তাদেরই 'নকশাল' বা 'মাওবাদী' তকমা দেওয়া হয়েছে।

বেঁচে থাকলে বীরসিংহ গ্রামের সেই পুরুষ সিংহকেও হয়তো গ্রেপ্তার করা হত যিনি শেষ জীবনটা কার্মাটারের সাঁওতালদের মাঝে কাটিয়েছিলেন। হয়তো ভারত সরকারই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছে কারা নিপীড়িত জনগণের প্রকৃত বন্ধু।

গত ৭ জুন ২০১৬ মধ্যপ্রদেশের মিডিয়া 'পত্রিকা' অলোক সাগরের ইন্টারভিউ ইউটিউবে আপলোড করে।

সাক্ষাৎকার শুনে অতি পরিচিত কোন মানুষের স্বয়ম্ভর গ্রামেরই রূপরেখা দেখতে পেলাম।

অলোক সাগর জানালেন, তিনি এমন এক পরিবারে বড় হয়েছেন যেখানে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হত।

তার ভাই এবং অন্যান্য পরিজনও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু, এই সমাজের প্রতিও তো নাগরিকের একটা কর্তব্য আছে। তাই ১৯৮২ সালে IIT দিল্লীর অধ্যাপনা ছেড়ে 'শ্রমিক আদিবাসী সংগঠন' ও 'কিষাণ আদিবাসী সংগঠনে'র সহযোগিতায় বেতুল ও হোসাঙ্গাবাদ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে কাজ শুরু করেন।

—তিনি কি হঠাৎ করে বাড়ি ছেড়ে কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন?

অলোক জানালেন, এটা সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত যা তিনি বাড়ির লোককে জানিয়েই গিয়েছিলেন। তাই তার কোন আপশোষ নেই, ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই।

কোচামু গ্রামের অধিবাসীদের কাছে জানা গেল অলোকের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে প্রায় ৫০,০০০ গাছ লাগানো হয়েছে।

হয়তো 'গাছ লাগান-প্রাণ বাঁচান' জাতীয় কোন স্লোগান শোনা যায়নি বলেই রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার চোখে পড়েনি।

—বর্তমানে অলোক কী করেন?

জানা গেল, আদিবাসীরা নিজেরাই গ্রামসভা ডেকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেন। আদিবাসীরা কাজের জন্য অর্থ না পেলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে তিনি আবেদন করেন। তাতেও কাজ না হলে দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা হয়। সাইকেলে চড়ে তিনি গ্রামগুলি থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য গ্রামে বিতরণ করেন।

তাহলে কি সরকার আদিবাসীদের দিকে নজর দিচ্ছে না?

অলোক, এতক্ষণ সারল্যমাখা হাসিমুখেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু, প্রশ্নটা শুনেই মুহূর্তে তার মুখ থমথমে হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ''আদিবাসীদের শোষণ করার দিকে তো খুব নজর দিচ্ছে।''

প্রশ্নকর্তা আবার বললেন, ''তাহলে আপনি বলতে চান সরকার আদিবাসীদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না?''

চাবুকের মত জবাব এল, ''সরকার যোজনাবদ্ধভাবে আদিবাসীদের লুঠ করার বিষয়ে খুবই মনোযোগ দিচ্ছে।''

মুহূর্তে 'চক্রব্যূহ' সিনেমার অক্সফোর্ড থেকে ইকোনমিক্সে PhD করা মাওবাদী নেতা গোবিন্দ রাম সূর্যবংশীর কথা মনে পড়ল। যিনি পুলিশ জেরায় বলেছিলেন, তিনি এমন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না যেখানে গরিবকে লুঠ করা হয়।

একটুও না থেমে অলোক বললেন, ''আপনি উদাহরণ চান?''

কেন্দুপাতা এখানকার আদিবাসীদের থেকে সরকার কিনে নেয়। ৫০ পাতার একটা করে বান্ডিল হয়। সারাদিনে ১০০টা বান্ডিলের আনুমানিক মজুরি ১০০ টাকার কিছু বেশি।

অর্থাৎ ১টা বান্ডিলে একজন আদিবাসী পায় প্রায় ১ টাকা। ১টা কেন্দুপাতায় সাধারণত দুটি বিড়ি তৈরি হয়। মানে ১ বান্ডিল পাতায় ১০০টা বিড়ি বানানো যায়।

এখানে, ২৫টা বিড়ির প্যাকেট ১৭-২০ টাকায় বিক্রি হয়। তাহলে ১০০টা বিড়ির দাম পড়ে ৭০-৮০ টাকা।

যে জিনিস ৭০-৮০ টাকাতে বিক্রি হচ্ছে তার জন্য আদিবাসী পেল মাত্র ১ টাকা।

তাহলে আপনিই ভাবুন কী নির্মম শোভা চলছে।

মনে পড়ছে 'Self Ruled Republic' ঘোষণা করা কুচেইপাদার গ্রামের কথা।

যারা পরিসংখ্যান দিয়ে বক্সাইট প্রকল্প বাতিল করে দেয়, তারা দেখিয়ে দেয় ১ টন মহুয়া ফুল তাদের স্থানীয় অর্থনীতিকে দেয় ১০০০০ টাকা। সেখানে ১ টন বক্সাইট দেবে মাত্র ৭০ টাকা।

এরপর শেষ প্রশ্ন।

আপনার কাছে কি কোন মডেল আছে যাতে ভেদাভেদ দূর হতে পারে?

অলোক বললেন, মানুষের কল্পনায় তৈরি সকল ভেদাভেদ মুছে ফেলার মডেল তার কাছে আছে এবং তা প্রয়োগের কাজ চলছে।

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রাকে, মননকে দূষিত করে তুলেছে দুর্নীতি। এই দুর্নীতিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর জীবনধারারই অঙ্গ, অর্থাৎ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। সমাজের সুস্থ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এই সংস্কৃতিকে আমরা অবশ্যই অপসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করব।

দারিদ্র দূরীকরণ

দিলীপ দাস মণ্ডল

আমাদের দেশ ভারতে গরিব আছে এবং সংখ্যার হিসাবে পৃথিবীতে প্রথম। জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকার দেশও অনেক আছে। প্রশ্ন হল আমাদের দেশে গরিবদের সংখ্যা খুব কম করে ফেলা বা একেবারে নির্মূল করবার মত অবস্থা এখানে আছে কিনা?

গরিবী টিকে থাকার জন্য অনেক কারণ আছে এবং সে কারণগুলোর প্রত্যেকটার একটা একটা করে পর্যালোচনা করা দরকার।

১. সমাজ কাঠামোয় গরিব করে রাখার ব্যবস্থা।

২. ধর্মীয় তত্ত্বগুলোর মধ্যে প্রচার করা হয় যে গরীবি স্বাভাবিক ঘটনা। এক্ষেত্রে ''অদৃষ্ট'' তত্ত্ব একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

৩. গরীবরা খুব কম শ্রমের সুযোগ পায়। শ্রমের সুযোগ পেলেও তার বদলে যে মজুরি পায় তাতে দারিদ্র মোচন হয় না।

৪. সরকার গরীবি হটানোর জন্য খুব কম পদক্ষেপ নেয়। পদক্ষেপ নিলেও যে সকল প্রকল্প নেয়, সেগুলোর মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হতে দেয় না।

এগুলো ছাড়া আরও যে সকল কারণ আছে সমস্তই পর্যালোচনা করা দরকার।

মানুষের মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে গেলে ন্যূনতম যে জিনিসগুলো চাই সেগুলো হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা। এই পাঁচটি বিষয় ভারতের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জিনিসগুলো ভারতের বহু কোটি মানুষ নির্দিষ্ট মাত্রায় পায় না, যা পরিলক্ষিত হয় ভারতে দারিদ্র সীমার নিচের (BPL) মানুষের সংখ্যার হিসাবে। সরকারি হিসাবে ভারতে বি.পি.এল. মানুষের শতকরা হার প্রায় ৩০ শতাংশ। দারিদ্রসীমার মাপ হল যদি কোন গ্রামের নাগরিক দৈনিক ২৮ টাকা খরচ করতে না পারে তাহলে সে দরিদ্র। শহরের ক্ষেত্রে ঐ মাপ হল ৩২ টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে দারিদ্রসীমা নির্ধারণের যে মাপ যোজনা কমিশনের পদ্ধতিতে চলে তার সমালোচনা সারা ভারত জুড়েই হয়েছে। দারিদ্রসীমার মাপ যাই হোক ভারতে গরিব আছে, তা আমরা আমাদের চারদিকে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাই।

দারিদ্র টিকে থাকার অসংখ্য কারণ আছে। কারণগুলোর প্রত্যেকটা সনাক্ত করার জন্য আবেদন রাখছি তাদের কাছে যারা প্রকৃতই দারিদ্র দূর করতে চান। কারণগুলো সনাক্ত করে, কারণগুলোকে সমাজ থেকে মুক্ত করতে পারলে অনেকটা গরীবি দূর হবে।

দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যে সকল প্রকল্প বর্তমানেও চলছে, তা থেকে একজন দরিদ্র মানুষ যে সুযোগ পায় তাতে তার দারিদ্র দূর হচ্ছে না কারণ দারিদ্রসীমার যে অর্থনৈতিক মাপ তা সুযোগগুলোর অর্থনৈতিক মাপের চেয়ে অনেক উপরে। সুতরাং দারিদ্র দূর করতে হলে প্রতি B.P.L. মানুষের আয় দারিদ্রসীমার অর্থনৈতিক মাপের চেয়ে বেশি হতেই হবে।

দরিদ্র মানুষের আয় বাড়ানোর জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে ১০০ দিনের কাজ একটি। ১০০ দিনের কাজের ব্যাপারে নিশ্চয়তার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার চেয়ে অনেক কম দিন কাজ পায় এই প্রকল্পের জব কার্ডধারীরা। এই কার্ডধারীদের মধ্যে যেমন BPL আছে তেমনি অনেক APLও আছে। সরকার যদি দারিদ্র দূর করার প্রকৃত পদক্ষেপ নিতে চায় তাহলে প্রথম কাজ সকল BPL-কে। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে যুক্ত করা এবং প্রকৃতই কমপক্ষে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করা।

BPL নির্ধারণের সময় রাজনৈতিক স্বজনপোষণ আমাদের এই সমাজে বর্তমানে হচ্ছে এবং ২০১১ সালের আগেও হয়েছে। দেখা যায় কিছু প্রকৃত BPL শাসক দলের বিরোধী হওয়ার জন্য BPL তালিকায় আসতে পারেনি। আবার এও দেখা যায় অনেক APL, শাসক দলের পক্ষের হওয়ার জন্য BPL তালিকায় এসেছে এবং তাদের কার্ড জোগাড় করেছে।

যারা প্রকৃত BPL তাদের জন্য প্রথমে ১০০ দিনের কাজের জবকার্ডের ব্যবস্থা করা দরকার। এই কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে শাসক দলের অবশ্য নিরপেক্ষ থাকতে হবে। নতুবা দারিদ্র মুক্ত হওয়া যাদের দরকার, তাদের অনেকেই দরিদ্র থেকে যাবে।

কাজ দেওয়ার সময় প্রত্যেক প্রকৃত BPL-কেই কাজ দেওয়া হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব যাতে না হয়। যে BPL কাজ পাবে না বা দারিদ্র দূর হবার মত আয় করতে পারবে না তার দারিদ্রও দূর হবে না।

গরিব সহ প্রায় সমস্ত সাধারণ মানুষের খাদ্যের সুবিধার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা আছে, যার মাধ্যমে গরিবদেরও কিছুটা দারিদ্র কমান যায় তার চিন্তা মাথায় রেখে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সাধারণ জনসাধারণের একটু সুবিধা হলেও তার মাধ্যমে গরিবরা তাদের দারিদ্র নিবারণ করতে পারছে না। কারণ দরিদ্র মানুষের যে আয় হলে দারিদ্র দূর হয় তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রেশনিং ব্যবস্থায় হয় না।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার জন্য সরকারি যে সকল ব্যবস্থা আছে, তা থেকে সাধারণ মানুষের কিছুটা উপকার হলেও, এই সকল সুবিধা

গরিবরাও পাওয়া সত্ত্বেও তাদের দারিদ্র নিবারণ হয় না। কারণ, এইসকল পরিষেবার আংশিক সুবিধা পাওয়া গেলেও আরও অনেক জিনিস মানুষের প্রাথমিক দায়িত্ব প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য যা দরকার তার সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করা, নতুবা ঐ সমস্ত জিনিস পাওয়ার মত আয়ের ব্যবস্থা করা।

দরিদ্র মানুষদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আয় করে দারিদ্র সীমার উর্দ্ধে থাকার মত। কিন্তু সেই আয়ের বেশিটাই মদ বা উচ্চমূল্যের ভোগ্যপণ্য ভোগ করার জন্য তাদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের অর্থ থাকে না, যার ফলে তাদের দারিদ্র থেকে যায় এবং BPL বলে স্বীকৃতি পায়। এরূপ মানুষ এবং ভবিষ্যতে যারা BPL থেকে APL-এ উঠার মত আয় করবে তারা যাতে যথেচ্ছ খরচ করে আবার BPL-এ ফিরে যেতে না পারে তার জন্য সামাজিক চেতনা বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে BPL স্বীকৃতি বাতিলের মত ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে হবে।

মনে রাখা দরকার যে, যথেচ্ছ খরচ করে গরিব থেকে যাওয়া মানুষের সংখ্যা অল্প। তাদের চেয়ে অনেক গুণ গরিব সমাজে আছে দারিদ্র দূর হওয়ার মত আয় করতে না পারার জন্য।

দরিদ্ররা যাতে দরিদ্রই থেকে যায় তার জন্য সমাজের মধ্যবিত্ত থেকে ধনিক শ্রেণির অনেকেই চাতুরি করে বা দুর্নীতির সাহায্যে দারিদ্রকে আটকে রাখে। যারা দারিদ্র আটকে রাখতে চায় তাদের সচেতন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করাতে চাই।

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

ভারতের মত দেশে শাসক এবং শোষকরা জানে গরিব এবং অশিক্ষিত মানুষদের নিয়ে যত সহজে ভোটের রাজনীতি করা যায়, সচেতন মানুষদের নিয়ে তত সহজ নয়। সেই কারণে শাসকরা দারিদ্র নিবারণের পূর্ণ চেষ্টা করবে কিনা সন্দেহ?

দরিদ্র মানুষরা মাঝে মাঝে তাদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে, কিন্তু শাসকরা দাবি পূরণ করতে না পারলে শোষিত মানুষের দাবির আন্দোলনকে নষ্ট করে দেয় বিভিন্ন কুটকৌশল প্রয়োগ করে। এ বিষয়ে কবির একটি পংক্তি উল্লেখযোগ্য।

"ভুখা নাঙ্গা যখনই খেতে চায় খাদ্য,
সীমান্তে বেজে উঠে যুদ্ধের বাদ্য।"

সরকার যদি দারিদ্র নিবারণের দুর্নীতিমুক্ত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে দরিদ্র মানুষদেরই একত্রিত হয়ে সাংবিধানিক অধিকারের বলে বলিয়ান হয়ে দাবি আদায় করবার পথ বেছে নিতে হবে।

বিজ্ঞানের বিশ্বাস এবং...

অনাবিল সেনগুপ্ত

"বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস'' শিরোনামটির মধ্যেই সুচতুর একটি কৌশল কাজ করে। বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের মধ্যে ধন্ধ তৈরি করার কৌশল। যেনতেন প্রকারে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা এটাই দাবী করে আসেন 'বিশ্বাস'-এর উপর একচেটিয়া শুধু তাদেরই অধিকার এবং যুক্তিবাদীরা সব 'অবিশ্বাসী'।

প্রথমেই বলি 'বিশ্বাস' (Type of Emotion) একটি 'অনুভূতি' বা 'Feeling' এবং এই অনুভূতি মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়াকলাপ জনিত ফলাফল। আর এই 'অনুভূতি' কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই যুক্তিবাদীরা মানুষ হওয়ার কারণে তাঁদের মধ্যেও 'বিশ্বাস' নামক 'অনুভূতি' বিদ্যমান। এরপরে আসা যাক যুক্তিবাদীদের 'বিশ্বাস' প্রসঙ্গে। ইহা কেমন এবং কি প্রকার? আমরা যুক্তিবাদীরা সর্বদাই যুক্তি তথা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। যুক্তিবাদীরা 'বিশ্বাস' করেন পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাদির পেছনে নির্দিষ্ট যুক্তি বা বিজ্ঞান আছে এবং যুক্তিবাদীরা এটাও 'বিশ্বাস' করেন কোনও ঘটনার পেছনে বর্তমানের যুক্তি বা বিজ্ঞান ভবিষ্যৎকালে বদলাতে পারে, তখন সেই যুক্তি বা বিজ্ঞান গ্রহণ বা বর্জন করে চলে বা করে চলেছে। যুক্তিবাদীরা বিশ্বাসী এবং তাদের বিশ্বাস বিজ্ঞানের প্রতি, যুক্তির প্রতি। ''সর্বকালের সেরা গুজব ঈশ্বরের (?)'' প্রতি নয়। তাই ''বিজ্ঞান বনাম ঈশ্বর'' সুচতুর কৌশলে হয়ে যায় ''বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস''।

আর ঈশ্বর বিশ্বাসীদের 'বিশ্বাস' এই পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার পিছনে রয়েছে 'ঈশ্বর' (?) নামক এক নিয়ন্ত্রক শক্তির হাত! তারা তাদের এই তাঁদের এই বিশ্বাসে অনড় বা স্থবির। তাদের এই বিশ্বাস তাঁরা সমাজের জোরপূর্বক আরোপ করে চলেন! এই বিশ্বাসীদের 'বিশ্বাস' থেকে জন্ম নেয় 'দ্বিচারিতা' বা বলা ভাল 'বহুচারিতা'। এঁদের ''বিশ্বাস'' আর ''কাঁঠালের আমসত্ত্ব'' এর মত এদের জীবনযাপন! এরাই সেই ঈশ্বর (?) বিশ্বাসের উপর নির্ভর না থেকে, এই পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞান বা যুক্তি নির্ভর প্রযুক্তির ফল চেটেপুটে সাবাড় করে বা করে চলেছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ আহরণ করে এই 'ঈশ্বর'-কে ঢাল করে।

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এই বহুচারিতা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধর্ম যেমন হিন্দু, ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় বিশ্বাসের আকার নিয়েছে! যদিও আদিম মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে শয়তান রূপে তুষ্ট করা শুরু করে, তার থেকেই 'নিয়ন্ত্রক ঈশ্বরের' (?) জন্ম হয়! এই শয়তান থেকে ঈশ্বরের উত্তরণের ইতিহাস আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যে ''অনুভূতি'' মানুষের বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে, সেই ''অনুভূতি'' মানুষকে ''আগাম বিপদ সংকেত'' দেয় বা ''সতর্কতা'' বা ''ভয়'' নামক ''অনুভূতির'' জন্ম দেয়। কয়েক কোটি বছরের মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (বিভিন্ন ধর্মীয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদের) গুলির সামাজিক অবদান শুধুই ''আদিম ভয়'' তৈরিতে ক্ষান্ত! এই ''আদিম ভয়ের'' বিশ্বাস আজ দূরীভূত হয় বিজ্ঞান বা যুক্তি নির্ভর বিশ্বাসের চর্চার মাধ্যমে। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করে দিয়েছে কিভাবে ''আর্থসামাজিক পরিবেশ'' মানুষের ''চিন্তা চেতনা'' তথা ''বিশ্বাসকে'' নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করে।

এখন দেখা যাক এই বিজ্ঞান কী? আপনার কাছে বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যাখ্যা নাও থাকতে পারে আবার এমনও হতে পারে আপনাকে জানতে দেওয়া হয়নি।

বিজ্ঞান (ইংরেজি ভাষায় : Science) হচ্ছে বিশ্বের যাবতীয় ভৌত বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, যাচাই, নিয়মসিদ্ধ, বিধিবদ্ধ ও গবেষণালব্ধ পদ্ধতি যা জ্ঞানকে তৈরিপূর্বক সুসংগঠিত করার কেন্দ্রস্থল। ল্যাটিন শব্দ সায়েনটিয়া থেকে ইংরেজি সায়েন্স শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ বিশেষ জ্ঞান। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোনও বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষ জ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তি বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানবিদ কিংবা বৈজ্ঞানিক নামে পরিচিত হয়ে থাকেন।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রকৃতি ও সমাজের নানা মৌলিক বিধি ও সাধারণ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বর্তমান বিশ্ব এবং এর প্রগতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাপক অর্থে যে কোনও জ্ঞানের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণকে বিজ্ঞান বলা হলেও এখানে এটি সূক্ষ্ম অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হবে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মূলত দুটি : সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-সহ এ ধরনের সকল বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে মানুষের আচার-ব্যবহার এবং সমাজ নিয়ে যে বিজ্ঞান তা সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে ধরনেরই হোক বিজ্ঞানের আওতায় পড়তে হলে উক্ত জ্ঞানটিকে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। আর একই শর্তের অধীনে যে গবেষকই পরীক্ষণটি করুন না কেন ফলাফল একই হতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি চেতনা অনুযায়ী বিজ্ঞনভিত্তিক পরীক্ষণের ফলাফল কখনও পরিবর্তিত হতে পারে না।

গণিতকে অনেকেই তৃতীয় একটি শ্রেণি হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ তাদের মতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান আর গণিত এই তিনটি শ্রেণি মিলে বিজ্ঞান। ঐ দৃষ্টিকোণে গণিত হল আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান, আর প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান হল পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে গণিতে মিল-অমিল উভয়ই রয়েছে। গণিত একদিক থেকে পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উভয়ই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্ধতিগত অধ্যয়ন করে। আর পার্থক্য হচ্ছে, পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হলেও গণিতে কোনও কিছু প্রতিপালন করা হয় আগের একটি শর্তের (Primarily) উপর নির্ভর করে। এই আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান, যার মধ্যে পরিসংখ্যান এবং যুক্তিবিদ্যাও পড়ে, অনেক সময়ই পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হলে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের প্রসার আবশ্যক। কিভাবে কোনও কিছু কাজ করে (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) বা কিভাবে মানুষ চিন্তা করে (সামাজিক বিজ্ঞান) তা বুঝতে হলে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই।" (সূত্র : উইকিপিডিয়া)

উক্ত 'বিজ্ঞানের' গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক ধাপ হল ''অনুকল্প (hypothesis)''। এই ধাপটি 'বিজ্ঞানের' 'বিশ্বাস' বলা যেতে পারে। এখন দেখা যাক কিভাবে এই ''অনুকল্প (hypothesis)" বা 'বিশ্বাস' 'বিজ্ঞানে' পরিণত হয় এবং 'বিজ্ঞান' বা 'যুক্তি' থেকে বর্জিত হয়।

"A hypothesis (plural hypotheses) is a proposed explanation for a phenomenon. For a hypothesis to be a scientific hypothesis, the scientific method requires that one can test it. Scientists generally base scientific hypotheses on previous observations that cannot satisfactorily be explained with the available scientific theories. Even though the words "hypothesis" and "theory" are often used synonymously, a scientific hypothesis is not the same as a scientific theory. A working hypothesis is a provisionally accepted hypothesis proposed for further research." —Wikipedia

দেখে নেওয়া যাক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কীভাবে তৈরি হয়?

সাধারণত প্রাকৃতিক কোনও ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে। একটি প্রাকৃতিক ঘটনা কেন ও কিভাবে ঘটেছে তার বিজ্ঞানসম্মত কারণ খুঁজতে চান বিজ্ঞানীরা। এই ঘটনা সম্পর্কে বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তথ্য, উপাদান সংগ্রহ করা হয়। তারপর বিভিন্ন তথ্য ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে একটি সাময়িক বা অস্থায়ী অনুকল্প (hypothesis) প্রস্তুত করা হয় যা ব্যাখ্যা করতে পারবে ঘটনাটিকে। একটি

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কখনোই কোন বিজ্ঞানীর মনগড়া কথা নয়। বহু তথ্য ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয় প্রত্যেকটি তত্ত্ব।

অনুকল্প তৈরি হয়ে যাবার পর রয়েছে তার সত্যায়ন। বহু তথ্যের সমন্বয়ে একটি অনুকল্প তৈরি করা হলেই এটিকে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় না। একটি তত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাকে প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তার যোগ্যতা যাচাই করতে হয়।

১. তত্ত্বের মূল নিয়মগুলো অবাধ (arbitrary), সরল ও কম পরিমাণে আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

২. তত্ত্বের সাহায্যে পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনার বিশাল একটি অংশকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে।

৩. তত্ত্বের সাহায্যে বহুবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্ত ভবিষ্যৎবাণী করা যাবে যা হুবহু মিলে যাবে।

এই তিনটি শর্ত পূরণ করার পরই একটি অনুকল্প মর্যাদা পেতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের। আর এই তিনটি শর্ত পূরণের জন্য অনেক অনেকবার ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়, তত্ত্বের সাহায্যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় অনেক ঘটনার এবং ঘটে যাবার পর মেলানো হয় ভবিষ্যৎবাণীর সাথে। এরকম বার বার পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়েই টিকে থাকে এক একটি তত্ত্ব, যে পরীক্ষাগুলো করাই হয়ে থাকে তত্ত্বটিকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য।

হাইপোথিসিস থেকে তত্ত্বে পরিণত হবার ৪টি ধাপ। একটি হাইপোথিসিস তৈরি হবার পর তাকে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের জন্য বেশ কয়েকটি ধাপে বারবার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

১. প্রথমেই তাকে বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে আঘাত করা হয়। সেই আঘাতে ভেঙ্গে না পড়লে সেটি নির্বাচিত হয় পরবর্তী ধাপের পরীক্ষার জন্য।

২. হাইপোথিসিস থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করার জন্য কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা হয় বা প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘটনা থেকে তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

৩. সেটার সাথে অনুকল্প থেকে প্রাপ্ত পূর্বনির্ধারিত ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে দেখা হয় তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। যদি সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় যদি বৈপরীত্য অথবা বড় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তবে পূর্বের অনুকল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনপূর্বক নতুন অনুকল্প নিয়ে আসা হয় যা আবার পরিচালিত হয় প্রথম ধাপ থেকে। যদি পরীক্ষার ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে কৃত্রিম পরিবেশের পরীক্ষা অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি করা হয়। একাধিকবার পুনরাবৃত্তির ফলাফল না মিললে বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে অনুকল্প বাতিল করা হয়

এবং নতুন অনুকল্পের সন্ধান করা হয়। বারবার পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রেই অনুকল্পটিকে 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

৪. একটি অনুকল্প বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই তত্ত্ব থেকে আরো কিছু অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এসকল অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা সেই প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নতুন ঘটনাকে বারবার যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা Scientific Law-এর মর্যাদা প্রদান করা হয়।

একটি সঠিক ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এরকম হাজারো পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যৎবাণীর সাহায্যে প্রমাণিত হয়। একটি ভুল ভবিষ্যৎবাণী বা একটি প্রধান বিষয়ের ব্যাখ্যাহীনতা বা ভুল ব্যাখ্যা কেড়ে নিতে পারে একটি তত্ত্বের বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার মর্যাদা। আর তার এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে তার স্থান নেয় আরেকটি হাইপোথিসিস, যেটি জন্ম দিতে পারে সঠিক তত্ত্বটিকে, যা হতে পারে একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান। সুতরাং একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে কোনোভাবেই প্রমাণিত বিজ্ঞানের চেয়ে কোনও অংশে ছোট করে দেখার উপায় নেই। হতেও পারে এই তত্ত্বটিই অদূর ভবিষ্যতে নিউটনের গতি সূত্রের মতই কোনও বাস্তব, দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিজ্ঞানের শিশুকাল।

স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত "A Brief History of Time" গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে। তার সংজ্ঞাটি ছিল,

"A theory is a good theory if it satisfies two requirements. It must accurately describe a large class of observations on the basis of a model that contains only a few arbitrary elements and it must make definite predictions about the results of future observations."

অর্থাৎ একটা তত্ত্বকে ভাল তত্ত্ব বলা যেতে পারে যদি সে তত্ত্ব দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অল্প কিছু স্বীকৃত নিয়মের ভিত্তিতে দাঁড় করানো কোনো মডেল যদি পর্যবেক্ষণের একটা বিরাট অংশকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং যদি সেখান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কেও নিশ্চিত ও নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করা যায়।" (সূত্র : ''তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা/Theoretical Physics")

ঈশ্বর বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে ভিড় জমায় সেই বিজ্ঞানের কাছে!

এখন দেখা যায় ''সর্বকালের সেরা গুজব, ঈশ্বর (?) বিশ্বাস"-এর বিজ্ঞানের আশ্রিত হয়ে টিকে থাকার লড়াই!

সব ধর্মের অনুসারীরাই দাবি করেন তাদের ধর্মগ্রন্থটি বিজ্ঞানসম্মত! অনেকে এমনও দাবী করেন বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার নাকি অনেক আগে থেকেই তাদের ধর্মগ্রন্থে বলে দেওয়া আছে। বিজ্ঞানের কোনও নতুন আবিষ্কারের পরেই তারা দাবী করে বসেন এটার কথা নাকি তাদের ধর্মগ্রন্থে অনেক আগে থেকেই আছে। এই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারা নানারকম প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সেগুলো সম্পর্কে একটু আলোকপাত করতেই এই লেখার অবতারণা। বিজ্ঞানের কোনও আবিষ্কারের পরে সেগুলো আগে থেকেই ধর্মগ্রন্থে আছে বলেন দাবীদাররা। কিন্তু আবিষ্কারের আগে ধর্মগ্রন্থ খুঁজে সেগুলো বের করতে পারেন না। তারা যদি এই কাজটি করতে পারতেন তাহলেই বিজ্ঞানীদের শ্রম, সময় আর অর্থ বেঁচে যেত! কিন্তু হায়, তা আর হচ্ছে কই! দেখা যাক কী ধরনের কৌশল তারা অবলম্বন করেন—

ধর্মীয় গ্রন্থকে বৈজ্ঞানিক দর্শন সাব্যস্তের চেষ্টা :

যেহেতু ধর্মগ্রন্থগুলো আমাদের অধিকাংশ মাতৃভাষায় রচিত নয় অথবা দুর্বোধ্য তাই বিপুল সংখ্যক পাঠককে ধর্মগ্রন্থ বুঝতে নির্ভর করতে হয় অনুবাদের উপর। আর এই অনুবাদের সময়ই সব থেকে বড় চাতুরিটি করে থাকেন ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানকারীরা। ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা এমন কিছু শব্দ ঢুকিয়ে দেন যা সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারের কোনও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সাথে মিলে যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক—

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদের বৈজ্ঞানিক ভুল :

বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম। বেদ (সংস্কৃত Véda ‘‘জ্ঞান’’) প্রাচীন ভারতে লেখা হয়েছে। এটি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। এর চারটি মূল অংশ রয়েছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ। অথর্ববেদ ৬/৪৪/১-এ বলা হয়েছে, ‘‘পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।’’

Atharva Veda 6.44.1 Firm stood the heaven, firm stood the earth, firm stood this universal world. Firm stood the trees that sleep erect : let this thy malady be still...

এবার দেখা যাক অথর্ববেদ ৬/৭৭/১। এখানেও বলা হয়েছে পৃথিবী স্থির।

Atharva Veda 6.77.1 Firm stands the heaven, firm stands the earth, firm stands this universal world...

পৃথিবী স্থির এটা বেদাংগেও রয়েছে। বেদাংগ (নিরুক্ত ১০/৩২) বলা হয়েছে, ‘‘সবিতা পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছেন খুঁটি দ্বারা।’’

Rig Veda 10/149 Savitar has fixed the earth with supports; Savitar has fastened heaven in unsupported space...

Rig Veda 18/89, Sam Veda 4/1/5 Indra hath fixed [Stopped] the earth and heaven as with an axle... (দেব ইন্দ্র পৃথিবীকে স্থির রেখেছেন)।

অথচ বিজ্ঞান বলে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলো গতিশীল। আমরা লক্ষ করেছি যে, প্রতিদিন সূর্য পূর্বদিকে উঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায় (আপাতদৃষ্টিতে)। এর কারণ পৃথিবী গতিশীল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সূর্যকে সম্মুখে রেখে পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তন ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। এটিই পৃথিবীর গতি। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার—আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। স্থির নক্ষত্রের সাপেক্ষে নিজের অক্ষের চারিদিকে পৃথিবীর একবার পূর্ণ ঘূর্ণনের সময়কালকে স্থির নক্ষত্র দিবস বলা হয়। এর মান ৮৬, ১৬৪.০৯৮৯০৩৬৯১ গড় সৌর সেকেন্ড বা ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯৮৯০৩৬৯১ গড় সৌর দিন। (পৃথিবীর ঘূর্ণনতল ও অক্ষের সঙ্গে অক্ষীয় নতির সম্পর্ক)। (সূত্র : বিসর্গ : অনলাইন পত্রিকা।)

ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআনে অসঙ্গতি ও বৈজ্ঞানিক ভ্রম :
কোরানের আকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভুল :
(৬৭) সুরা আল মূলক : আয়াত - ০৩ :

''যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন সুবিন্যস্তভাবে। তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তারপর তুমি দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাও, তুমি কি কোন ফাটল দেখতে পাচ্ছ?'' (অনুবাদ : ড. জহুরুল হক)

এই আয়াত অনুযায়ী, ''আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে অথবা সুবিন্যস্তভাবে। মানুষ বা মুহাম্মদ আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন খুত বা ত্রুটি অথবা অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাবে না। যদি মানুষ অথবা মুহাম্মদ দৃষ্টি ফিরিয়ে ভালো করে দেখে তবুও আকাশের কোন ফাটল বা ত্রুটি দেখতে পাবে না। অর্থাৎ আল্লাহ আকাশ সুবিন্যস্তভাবে ও স্তরে স্তরে সাত আকাশ তৈরি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নেই বা অসামঞ্জস্যতা নেই। অনেক ভালো করে তাকিয়ে দেখলেও তাতে কোন ত্রুটি বা ফাটল দেখতে পাওয়া যাবে না। তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে যে, আকাশের সংখ্যা সাতটা এবং এই আকাশ তৈরিতে কোন ত্রুটি বা ফাটল নেই। আর মানুষ যদি ভালো করে দেখে তবুও আকাশের কোন ফাটল সে দেখতে পাবে না। অর্থাৎ আকাশ একটি শক্ত কঠিন পদার্থ আর আকাশের কোন ফাটল নেই। আর আকাশ তৈরি করা হয়েছে একটার উপর আরেকটা এভাবে সাতটা। আল্লাহর ভাষ্য মতে আকাশ সাতটা এবং আকাশ তৈরি করা হয়েছে শক্ত

কঠিন পদার্থ দিয়ে অতি সুনিপুণভাবে। এত ভালো করে তৈরি করা হয়েছে যে এতে কোন ফাটল নেই। আর ফাটল থাকা সম্ভব শুধু শক্ত কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আল্লাহর কথা মত আকাশ শক্ত কঠিন পদার্থের তৈরি।"

কিন্তু বাস্তব আকাশ সাতটা নয় বরং একটা। অর্থাৎ আমাদের আকাশ একটা এবং এটি গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়। এটি তৈরি হয়েছে গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে। আর তাই গ্যাসীয় পদার্থের (বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত) তৈরি আকাশের কোন ফাটল থাকা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব নয়, কিন্তু বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে প্রতিটি পদার্থের মধ্যে ফাঁক যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ''আন্তঃআণবিক ফাঁক" বলে। এবং বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং (পরিবেশ দূষণের) কারণে আল্লাহ এর ভাষ্যকে ভুল প্রমাণ করে পৃথিবীর আকাশে বা পৃথিবীকে ঘরে থাকা এবং পৃথিবীকে মহাজাগতিক বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মিকে প্রতিহতকারী 'ওজন স্তরে' ফাটল দেখা দিয়েছে!

অনুবাদকের ইচ্ছাকৃত ভুল :

সূরা সারিষার ৪৭, ৪৮ নং আয়াতের মূল অনুবাদ— ''আর আসমানকে আমি আপন হাতে সৃজন করিয়াছি এবং আমি অবশ্যই সব ক্ষমতাই রাখি। আর পৃথিবীকে আমি প্রসারিত করিয়াছি, আমিই চমৎকার বিছাইতে পারি।"

সাম্প্রতিকালে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের সাথে মিলানোর জন্য পরিবর্তিত অনুবাদ— ''আকাশমন্ডলী, আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি।" (এই আয়াত দিয়ে মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল এটা যে কোরানে বলে দেওয়া হয়েছে আগে থেকে এই দাবি করা হয়! যদিও এখনও সর্বাধুনিক তত্ত্ব স্ট্রিং থিউরি নিয়ে কোন আয়াত হাজির করেনি ধর্মীয় মৌলবাদীরা!)

এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। একদিকে যেমন অনুবাদে ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবর্তন আনা হয়, অন্যদিকে আয়াতগুলোও ভাসাভাসা, সেখানে অনেক খুঁজে পেতে 'বিজ্ঞান' বের করতে হয়! আধুনিক কালের জাকির নায়েক মূলত এই চাতুরিটি সব থেকে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। আসলে এই ধর্মীয় ব্যাখ্যাকাররা ধর্মকে যৌক্তিক বলে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাসকে পাকা করার জন্য যুক্তি তৈরি করে।

এ কিভাবে বাইবেলেও বহু বৈজ্ঞানিকী ভুল ধরা পড়ে :

আধুনিক বিজ্ঞান বলে পৃথিবী সূর্যের অংশ। কিন্তু বাইবেল বলছে সূর্য সৃষ্টির আগেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এবং সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রথমে জলেতে নিমজ্জিত ছিল। এমনকি এখানে সূর্য ছাড়া দিন এবং রাত্রি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যা কিনা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। উৎস (সূর্য) ছাড়া পৃথিবীতে আলো আসে কিভাবে?

"Then God said, "let there be an expanse betwen the waters, separating water from water!" So God made the expanse, separating the water beneath the expanse from the water above it. And so it was. God called the expanse "sky". The twilight and the dawn were the second day. [Book of Genesis, ch : 1; Vers : 6-8]"

আর এই ধর্মীয় গ্রন্থের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্ভুল এবং অক্ষয় রাখতে রাষ্ট্রীয় শাসকদের বা তাদের তল্পিতল্পা বাহকদের জুড়ি মেলা ভার! মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির বিখ্যাত বিজ্ঞানী। উনি দাবি করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিষ্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা বের করে গেছেন, বেদ-এ নাকি সে সমস্ত আবিস্কার 'খুবই পরিষ্কারভাবে' লিপিবদ্ধ আছে। মি. দাসগুপ্তের ভাষায়, রবার্ট ওপেনহেইমারের মতো বিজ্ঞানীও নাকি 'গীতা'র বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ল্যাবরেটরিতে আণবিকশক্তির তেজ দেখে 'গীতা' থেকে আবৃত্তি করেছিলেন—

''দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস মহাত্মনঃ"

বিজ্ঞান-জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী আছেন যারা ভাবেন, আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিষ্কার করছে, তা সবই হিন্দু পুরাণগুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এ বলা শুরু করেছে যে, 'কৃষ্ণ গহ্বর' কিংবা 'সময় ধারণা' নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়। হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল। কীভাবে? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে, 'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান'।

কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে, মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক 'পারমাণবিক যুদ্ধ' (Atomic War)। প্রশান্ত প্রামাণিক নামে ভারতের এক 'জনপ্রিয়' বিজ্ঞান লেখক 'ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান' বইয়ে তার কল্পনার ফানুস মহেঞ্জোদারো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন— 'সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোনও মিত্রশক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদারোতে'।

'সবই ব্যাদে আছে' মার্কা এইসব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবি করে ফেলেন যে, নলজাতক শিশু (Test Tube Baby) আর বিকল্প মা (Surrogate Mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোণী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনিগুলো তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট

মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত 'বরুণ বাণ' আর 'অগ্নিবাণ' বই কিছু নয়। তারা সবকিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান।

সংখ্যা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি : এই প্রতারণাটি খুব মোক্ষমভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে কারণ সাধারণভাবে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে, যা অংক কষে দেখানো যায় তা একেবারেই নির্ভুল! অংকে বা গণিতেও যে গোজামিল বা ফাঁক থাকতে পারে সেটা তারা ভেবে দেখে না। যেমন বলা হয়ে থাকে কোরানে সূরা সংখ্যা ১১৪, আয়াত সংখ্যা শব্দ সংখ্যা অক্ষর সংখ্যা প্রতিটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এরকম গাণিতিক ভাবে সাজানো একটি গ্রন্থ ঐশ্বরিক না হয়ে যায় না! আসলেই কি তাই?

পদ্য আকারের বা ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলোর অক্ষর, শব্দ ইত্যাদির সংখ্যা নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য হতে পারে ছন্দোবদ্ধতার কারণেই। ছন্দ মেলালে অসচেতন ভাবেও এই মিল চলে আসতে পারে। যেমন পয়ার ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলোর অক্ষর প্রায়ই ১৪, ৭ ও ২ দিয়ে বিভাজ্য। মহাভারত সহ নেক বিশাল কাব্যগ্রন্থ পুঁথি এই ছন্দে লেখা। মূল আরবি কোরানও একটি ছন্দোবদ্ধ রচনা। সেখানেও এই ধরনের ঘটনা থাকাটা অলৌকিক কোন ব্যাপার নয়। অনেক সময় অনেক চতুর ব্যাখ্যাকাররা এরকম কিছু সংখ্যার প্রমাণ হাজির করেন। সেগুলো মূলত অনুবাদের চাতুরী ব্যতীত কিছু নয়।

প্রচলিত ধর্মীয় আচারগুলোকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার :

রোযার সময় দেখা যায় পত্র-পত্রিকাগুলোতে রোযা কিভাবে শরীরের উপকারি এই শিরোনামে বিশাল ফিরিস্তি ছাপা হয়। এসময় চিকিৎসকরাও রোযার স্বপক্ষে বলতে বাধ্য হন! রোযাকে স্বাস্থ্যপ্রদ বলা মোটেও ঠিক নয়। এমন কেউ নেই যে রোযার প্রথমদিকে গ্যাস্ট্রিক বা পেটের সমস্যায় আক্রান্ত হন না। তবে আমাদের বায়োলজিকাল সিস্টেমের কারণে খুব দ্রুতই তা খাপ খাইয়ে নেয়। হিন্দু ধর্ম সহ অনেক ধর্মেই উপবাস প্রথা প্রচলিত আছে এবং সকলেই এর পক্ষে 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন!

হিন্দুদের বিশ্বাস তুলসী গাছে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকে। এর ফলে গাছটি পবিত্র এবং রোগ বালাই থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভেষজগুণ সম্পন্ন গাছ, রোগ বালাই দূর করতে এই ভেষজগুণই যথেষ্ট। তেত্রিশ কোটি কেন, একজন দেবতারও প্রয়োজন নেই! এখন 'গোমাতার' শরীরেও তেত্রিশ কোটি দেবতা বাস করছে! গোমূত্র এবং গোবর এখন প্রধান প্রসাদ রূপে স্থান পেয়েছে!

সেই উৎসাহে ধার্মিক বিজ্ঞানীগণ ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে গোমূত্র থেকে সোনা আবিষ্কার করবে বলে চর্চা করছেন!

জনপ্রিয় বিজ্ঞানের (Pop-Science) নামে ভাঁওতাবাজি :

বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল স্বঘোষিত বিজ্ঞানী বুজরুকি চালিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে আসে ''অ্যালকেমি''দের কথা, একদল স্বঘোষিত রসায়ন বৈজ্ঞানিকী যার সহজলভ্য ধাতু (লেড) থেকে সোনা বা কৃত্রিক উপায় সোনা তৈরির জন্য বিভিন্ন রকমারি গবেষণা করেন, যার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই এবং যার বেশিরভাগই ধর্মীয় রীতিকে (ভারতীয় তন্ত্রসাধকদের মত) সমর্থন করে! পরবর্তী কালে এই চর্চা (সমাজে হানিকারক) কিছু দেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। এখনো ভন্ড ধর্মীয় প্রতারকগণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারাকে অবলম্বন করে প্রতারণার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন শব্দ যেমন স্টিং থিয়োরি, ন্যানো পার্টিকেল, ইলেকট্রন, বোসন কণা, বিগ-ব্যাং ইত্যাদি সাধারণ মানুষ নাম শুনেছে মাত্র কখনো কিন্তু খায় না মাথায় দেয় জানে না। তাই এইসব জটিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নামকে কাজে লাগিয়ে কিছু বিখ্যাত ভন্ড বাবাজি, মাতাজির ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে! আর সমাজেরই কিছু মিডিয়া এই ভন্ডদের ভুলচর্চাকে উৎসাহিত করতে কিছু বিজ্ঞানীর ভুলচর্চাকেই প্রকাশ করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মনি ভৌমিক এবং তার বই ''বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত'' নামটি বলতেই হয় আর একে তোল্লাই দিয়ে চলেছে বাংলার স্বঘোষিত সবথেকে জনপ্রিয় সংবাদপত্র!

ধার্মিক বিজ্ঞানীদের উদাহরণ প্রদান :

ধার্মিকদের আরও একটি প্রিয় ব্যাপার হল যেসকল প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা ধর্ম পালন করেন তাদের উদাহরণ টানা, যেন বিজ্ঞানীরা বলেছেন বলেই সেটা সঠিক। নিউটন কিংবা আইনস্টাইন কিছু বললেই কিন্তু সেটাকে সবাই মেনে নেয়নি, তাদেরকে সেটা প্রমাণ করে দেখাতে হয়েছে। কাজেই কোনও বিজ্ঞানী বললেই সেটা সঠিক ব্যাপার এমন নয়, তাকে সেটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে। অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা নিজ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করলেও অন্য ক্ষেত্রে আজন্ম লালিত সংস্কারের দ্বারাই চালিত হন। এটা কখনই ধর্মের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নয়! আবার অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ঈশ্বর বলতে প্রকৃতিকে বুঝিয়ে থাকেন, এই ঈশ্বর প্রচলিত ধর্মের ঈশ্বর নন। যেমন, আইনস্টাইন! তিনি ঈশ্বর বলতে প্রকৃতির মহাশক্তিকে বুঝিয়েছেন, কোনও প্রচলিত ধর্মের ঈশ্বরকে না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা :

যে তত্ত্বগুলোকে কোনও ভাবেই ধর্মের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়না সেই তত্ত্বগুলোকে তখন বাতিল করে দেয় ধর্মীয় চেতনাধারীরা। যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ। বিবর্তনবাদের মত একটি প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত তত্ত্ব ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক বলে একে অস্বীকার করে ধর্মান্ধরা। অবশ্য যতই দিন যাচ্ছে, বিবর্তনের পক্ষে ততই প্রমাণ জোরদার হচ্ছে। বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। হাজার বছরের স্বীকৃত কোনো তত্ত্ব মুহূর্তেই বাতিল হয়ে যেতে পারে। আর এটাই বিজ্ঞানের সৌন্দর্য। বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ করেন। কাজেই এখন কোনও কিছুর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারছে না মানে এই না যে ভবিষ্যতে পারবে না। কাজেই কোনও কিছুর ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেই সেটাকে বিজ্ঞানের ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করে রহস্যময় আখ্যা দেওয়াটা একপ্রকার চাতুরী, যা ধর্ম অনুসারীরা করে থাকে। তাদের ভাষায়, 'কোনও এক জায়গায় এসে বিজ্ঞন থেমে যায়, সেটাই স্রষ্টার জগত'। 'বিজ্ঞান' থেমে যায় মানে এই না যে সে আর এগোবে না। যতই দিন যাবে ততই বিজ্ঞানের অতিক্রান্ত পথ বাড়বে এবং তথাকথিত স্রষ্টার জগৎ সংকুচিত হবে।

যৌক্তিক কষাঘাত থেকে ধর্মকে বাঁচাতে ধার্মিকরা অত্যন্ত সংগঠিত ভাবে কাজ করে চলছে। এজন্য তারা অর্থ খরচ করতেও কার্পণ্য করছে না। বাজারে সহজলভ্য (এমনকি বিনামূল্যে বিতরণ) করেছে এদের তৈরি অসংখ্য বই, সিডি, ভিডিও, পত্রিকা ইত্যাদি। মরিস বুকাইলি নামক এক লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' বইটি একটি উদাহরণ। সেখানে কোরানকে বিজ্ঞানসম্মত করার এমন অনেক অপচেষ্টা লক্ষণীয়। যদিও বুকাইলি সাহেব নিজে কেন মুসলমান হলেন না সেই প্রশ্ন থেকেই যায়! আধুনিক কালে ইন্টারনেট ব্যবহার করেও তারা এই কাজটি করছে। লেখাপড়া জানা অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ছে। এদেরকে প্রতিহত করতে আমাদের বিজ্ঞান জানতে হবে, বুঝতে হবে, বৈজ্ঞানিক চেতনায় নিজেদেরকে গঠন করতে হবে এবং এদের সমস্ত অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে দিতে হবে।

ধর্মীয় মৌলবাদীরা বুঝেছে যে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু উভয়ের পথ ও পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব গোজামিল ছাড়া উপায় কি? একমাত্র সঠিক শিক্ষা আর বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিবাদী চিন্তা ভাবনাই এদের প্রতিরোধ করতে পারে। পথটা সহজ নয়, কখনও সহজ ছিল না। ধর্মীয় মৌলবাদীর দল সক্রেটিসকে হেমলক (বিষ) খাইয়ে মেরেছে, ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়েছে, গ্যালিলিওকে অন্ধকার ঘরে বন্দি করে রেখেছিল (অন্ধ হয়ে যান) তবুও থেমে থাকেনি ধর্মীয় অন্ধকার সরিয়ে বিজ্ঞান তথা যুক্তিবাদের চর্চা এবং তাতেই সংঘর্ষ

অনিবার্য হয়ে পড়েছে, সেই থেকেই বিজ্ঞান তথা যুক্তিবাদের নির্মাণ শুরু। নিরুপায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (?) বিজ্ঞান তথা যুক্তিবাদের জয়যাত্রা রুখতে, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ যুক্তিবাদী হত্যাই তার প্রমাণ।

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১। মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন : প্রবীর ঘোষ
২। আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না : প্রবীর ঘোষ
৩। উইকিপিডিয়া এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা/Theoretical Physics
৪। www.bigganjatra.org.
৫। বিজ্ঞানের চেতনা : জে ব্রনোওস্কি
৬। বাইবেল, কোরান, বিজ্ঞান : মরিস বুকাইলি
৭। বিসর্গ : অনলাইন পত্রিকা
৮। কোরান শরিফ : ইসলামি ফাউন্ডেশন

যুক্তিবাদী মানসিকতাই জনগণকে পরিচালিত করবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, আমলাতন্ত্র ঘোচানোর সংগ্রামে, বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে নীতিবোধ ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এ-গুলো কোনওটাই পৃথক পৃথক ব্যাপার নয়, পরস্পর সম্পর্কিত।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে মানুষের চিন্তাকে কএকমুখী করে তোলা সম্ভব, মানুষকে মোটামুটি করা সম্ভব— এটা আজ প্রমাণিত সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি—বিপ্লবের আগে, বিপ্লব কালে এবং বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম।

ভূতের গ্রামে স্টার আনন্দের সঙ্গে টানা তিনদিন

প্রবীর ঘোষ

'বেনাগাম'। বড় বড় কিছু বাড়ি আছে। আছে টাইম কল। আছে লক্ষ্মী মন্দির। গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে আসানসোল-ধানবাদ রেল লাইন, মালগাড়িও যায়। গ্রামের পাশে চাষের জমি আছে। কাছেই জি. টি. রোড।

বাড়িগুলোর এখন ভগ্ন অবস্থা। দরজা-জানালা খুলে নিয়ে গেছে এই অঞ্চলের সমাজ বিরোধীরা। সুরকির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। গ্রাম শুনশান। লোকজন থাকেন না। কেন? স্টার আনন্দের আসানসোল অঞ্চলের সাংবাদিক ভেঙ্কটেশর লাহিড়ির পাঠান খবর বেনাগ্রামে ভূতের উপদ্রবে মানুষ সব গ্রাম ছাড়া।

প্রচারের দিন ২৮/০৬/২০০৫ সাল।

লোম খাড়া করা খবর। গ্রামের মানুষরা রাত দুপুরে শুনতে পায় নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, ঝুমুরের ঝুম-ঝুম আওয়াজ। একি নারীর মৃত আত্মার কান্না? কিছুদিন আগেই রেললাইনের ধারে একটি মেয়েকে খুন করে ফেলে যায় কারা যেন! এই অঞ্চলে ওয়াগান-ব্রেকারদের রমরমা। ওরাই কি খুন করে ফেলে গিয়েছিল। খুনের আগে কি অত্যাচার চালিয়েছিল? হয়তো এই সবই হয়েছিল।

ভূতের এই ভয়ংকর গায়ে কাঁটা দেওয়া অত্যাচারে একে একে গ্রামের মানুষরা গ্রাম ছেড়েছেন।

এর পর সেই দিনই স্টার আনন্দের পক্ষ থেকে প্রযোজক সুবীর চক্রবর্তী জানালেন, আমি রাজি হলে কাল ভোর রাতেই বেনাগ্রামে নিয়ে যাবে ওদের গাড়ি। আমি জানালাম, আমার সঙ্গে বর্ধমান থেকে গাড়িতে উঠবেন আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির অন্যতম সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার। সুবীর জানার্লের এডিটর সুমন চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়ে দেবেন। আমার সঙ্গে স্টার আনন্দের অ্যাঙ্কার ঋতব্রত ভট্টাচার্য যাবেন। তাঁর কাছে টাকা দেওয়া থাকবে। আমাদের দুজনের খাওয়ার সব খরচও দিয়ে দেবে। পারিশ্রমিক হিসেবেও টাকা মিলবে। সেটা কলকাতা অফিস থেকে মেটান হবে। আর ওদের ওবি ভ্যান রাত ১২টা নাগাদ স্টার্ট দেবে। প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় বিরতিহীন ভাবে লাইভ প্রচার চলবে। অন্তত দুদিন থাকতেই হবে।

রাজি হলাম।

পরের দিন, ২৯.৬ রাত ৩টে নাগাদ আমি স্টার আনন্দের গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে ছিলেন অ্যাঙ্কার ঋতব্রত।

বর্ধমান থেকে উঠলো আমাদের সমিতির সম্পাদক ও স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক সঞ্জয় কর্মকার।

সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় লাইভ টেলিকাস্ট। স্থানীয় স্টার আনন্দের সাংবাদিক ভেঙ্কটেশ লাহিড়ি হাজির। আমরা গোটা গ্রামটায় একটা চক্কর লাগালাম, হাড়পাঁজরা বের করা বাড়িগুলোও গজিয়ে ওঠা জঙ্গলে ভরে গেছে। মোরামের রাস্তা ভাঙা-চোরা। স্টার আনন্দের অনুষ্ঠান দেখে দু-তিনজন হাজির হয়ে গেল। তাঁদের সঙ্গেও কথা বললাম। ওদের কথায় জানলাম প্রতিটি কর্মক্ষম পুরুষরাই কোলিয়ারিতে মোটা মাইনেয় কাজ করে। সুতরাং ভূতের গ্রামে কে থাকবে বলুন?

ঠিক কথা।

কুলটি পুরসভার চেয়ারম্যানের মোবাইল নম্বর ভেঙ্কটেশের কাছ থেকে নিলাম। ফোন করে তাঁকে বললাম, আপনার ২ নম্বর ওয়ার্ড হল বেনাগ্রাম। সেখানে স্টার আনন্দ ওবি ভ্যান নিয়ে হাজির হয়েছে। আধঘন্টা পরপর লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে। আপনি আপনার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানকে নিয়ে চলে আসুন মিনিট পনেরর মধ্যে। ইতিমধ্যে শুনে নিয়েছি—চেয়ারম্যান কংগ্রেসের নেতা। ভাইস-চেয়ারম্যান ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা।

দুজনেই পৌঁছে গেলেন। দুজনের উপস্থিতিতেই কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁদের দুর্দশার কথা শোনালেন। আশেপাশের গ্রামে বাড়ি বাড়ি কলের জল পৌঁছে গেছে। পৌঁছয়নি শুধু বেনাগ্রামে। পাকা রাস্তা নেই। ওয়াগান-ব্রেকার ও খুনে গুন্ডাদের আড্ডা। প্রশাসন সব জেনেও কেন চুপ? আমাদের গ্রামে কেন বিদ্যুৎ নেই?

ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখান হচ্ছে সারি সারি তাল গাছ। দেখভালের অভাবে অনেক বাড়ি থেকেই ঝুলছে বটের ঝুরি।

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব অভিযোগ তো শুনলেন। আপনারা এই নিষ্কৃতির অভিযোগ তো একটু উদ্যোগেই মেটাতে পারেন। কী করবেন। বলুন ক্যামেরার সামনে।

চেয়ারম্যান বললেন, আমরা আজ-কালের মধ্যে শালবল্লি এনে ফেলব এগ্রামে, বিদ্যুৎ আনবো। রাস্তা পাকা করে দেব কথা দিচ্ছি। বাড়ি বাড়ি কলও হবে। কিন্তু তার পরেও মানুষরা গ্রামে ফিরবে কিনা, সন্দেহ আছে। ভূতের ভয় থেকে মুক্ত করবে কে? ওরা তো ভূতের ভয়েই গ্রাম ছেড়েছে।

বললাম, ভূতেরা অন্ধকারে থাকে। আপনারা আলো আনুন, আমরা ভূত তাড়াবো।

রাতটা পুরোপুরি কাটালাম গ্রামটার আনাচে-কানাচে ঘুরে। সঙ্গ ভেঙ্কটেশ্বরও। না, এত পরিশ্রমের পরও ঝুম-ঝুম আওয়াজ, কান্না আওয়াজ কিচ্ছুটি পেলাম না।

আমার সন্দেহ ছিল, স্টার আনন্দকে একটা ধামাকাদার খবর খাওয়াবার জন্য ভূত আমদানি করেছিলেন ভেঙ্কটেশ ভাই-ই।

যাই হোক পরদিন লরি লরি শালবল্লি পরল। সে ছবি দেখালাম আমরা। নারকেল ফাটিয়ে, কোদাল, গাঁইতি চালিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হল।

হ্যাঁ, একটা কথা ইতিমধ্যে ঘটেছে। কাল ব্রেকফাস্ট, লাইব, ডিনার সবই খেতে হয়েছে পাশের একটি আধা-শহরে গিয়ে।

স্টার আনন্দের দুজন ড্রাইভার, ফটোগ্রাফার, ক্যামেরাম্যান, ওবি ভ্যানের স্টাফ ও ঋতব্রতর খবর আনা হয়েছে, কিন্তু আমাাদের খেতে যেতে হয়েছে। ঋত বলেছে, যা ইচ্ছে খান। এখন নিজেরাই টাকাটা খরচ করুন। অফিসে পৌঁছে দিয়ে দেবো।

ওর সঙ্গে আমার কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা বললো, একটা টাকাও পাব না। হ্যাঁ সত্যি, আজ অবধি সে টাকা পাইনি।

যাক রহস্য উন্মোচনে ফিরি। সেই গ্রামে একটা লক্ষ্মী মন্দির আছে। বছরের একটা দিন, কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর দিন গ্রামের মানুষরা আসেন পুজো দিতে। কারণ ওঁদের বিশ্বাস—বেনাগ্রামের লক্ষ্মী খুব জাগ্রত।

দ্বিতীয় দিন ও সারারাত খুঁজেও ভূতের নাচ-কান্না কিছুই শুনতে পেলাম না।

এদিকে স্টার আনন্দের প্রতি ঘন্টা পর পর আধঘন্টার প্রচারে প্রচুর লোকের আগমন ঘটলো। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই জানালেন রাস্তা, আলো, জল এলে গ্রামে ফিরবেন।

স্টার আনন্দের সঞ্চালকের অনুরোধে আসল ভূতের হদিশ দিলাম না। শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে জানালাম, ভূতের উপদ্রব আর হবে না। একটা দুষ্টুলোক আপনাদের পাড়াছাড়া করার জন্য টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে গ্রাম ঘুরে ভূতের কান্না আর ঝুমুরের আওয়াজ শোনাত। সে আর কখনই এমন কাজটি করবে না। তাই তাকে একটা সংশোধনের সুযোগ দিলাম। আবার এরকম ঘটালে তাকে জেলে পাঠাব।

এবার ফেরার পালা। আমি ঋতব্রত আর সঞ্জয় একটা গাড়িতে। জনগণের বিশাল উল্লাস-ধ্বনীর মধ্যে গাড়ি স্টার্ট দিল।

২৯ জুন ২০০৩ : দেবু তান্ত্রিকের ভাণ্ডাফোড়

সন্তোষ শর্মা

বারাসাতের কালীর সাধক 'দেবু তান্ত্রিক' তাঁর তৃতীয় নয়নের (?) সাহায্যে বলে দেন ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। কেউ কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে দেবু তান্ত্রিক তাঁর অলৌকিক (?) শক্তির দ্বারা সবকিছু বুঝতে পারেন এবং সমস্যার সমাধানের জন্য স্টোন বা মাদুলি দেন। এই স্টোন বা মাদুলি দেওয়ার পিছনে ঘটনাটি হল—কেউ দেবু তান্ত্রিকের কাছে কোনও সমস্যা নিয়ে হাজির হলে, সেই ব্যক্তির হাতে ফুল দেন এবং ফুল ছিঁড়ে একটি কাগজের টুকরোতে রাখতে বলেন। ফুল সমেত কাগজ নিয়ে কালীমূর্তির সামনে দেবু তান্ত্রিক প্রার্থনা শুরু করেন, ''হে মা, ওদের বিরাট সমস্যা। ভালো মাদুলিটা দে। ছোট নয়, বড়টা, ভাঙাটা যেন দিস না আবার। ভুল করে ময়লা মাদুলিটা দিস না। চক্‌চকেটা দে।" মায়ের কাছে কাকুতি মিনতির পর কাগজটা সেই ব্যক্তির হাতে দিয়ে দেবু তান্ত্রিক খুলতে বলেন। কাগজ খুলতেই বেরিয়ে আসে মাদুলি। সত্যি দেবু তান্ত্রিক খেল দেখাল। দেবু তান্ত্রিকের কাছে যে কোনও সমস্যার সমাধান আছে। প্রেম ভাঙতে হবে? জোড়া দিতে হবে? বিবাহে বাধা? ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজনের প্রেমের জোড়া লাগাতে কৌশলে বাদ্যযন্ত্র খোল-এ একটু ছোট্ট টোকা মেরে খোল ফাটিয়ে বলে দিলেন সব ঠিকঠাক আছে।

সব শেষে প্রবীর ঘোষ তাঁর সমস্যার কথা দেবু তান্ত্রিককে বললেন, ''একজন মেয়ের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করি। বিয়ে করতে চাই। নাম পারমিতা রুদ্র।" প্রবীর ঘোষের কথায় দেবু মায়ের কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন, গলায় বাংলা মদ ঢাললেন। তারপর দেবু তান্ত্রিক নিজের কেরামতি শুরু করলেন। প্রবীর ঘোষের হাতে ফুল দিয়ে মুঠো করে ধরে রাখতে বলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। চিৎকার করে বললেন, ''ওকে একটা সাদা স্টোন দে মা।" কিছুক্ষণ পরে মুঠো খুলতে বললেন। প্রবীর ঘোষ মুঠো খুললেন, ফুলের মধ্যে দুটো স্টোন। একটা সাদা একটা লাল। দেবু তান্ত্রিক বলছিলেন, আপনার হাতে একটা স্টোন আসবে। কিন্তু দুটো স্টোন কী করে এল? চালাক তান্ত্রিক বললেন, ''মা দুটো স্টোন ভুল করে পাঠিয়েছেন। একটি প্রবীর ঘোষের ও একটি আমার জন্য।" প্রবীর ঘোষের সামনে দেবু তান্ত্রিকের চালাকি ধরা পড়ে গেল। কারণ, মাটির কালী-মূর্তির কোনও কিছু পাঠানোর ক্ষমতা

নেই। প্রবীর ঘোষের হাতে ফুল দেওয়ার সময় দেবুই একটা স্টোন ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এবং দ্বিতীয় স্টোনটি প্রবীর ঘোষ নিজেই হাত সাফাই করে মুঠোর মধ্যে রেখে নিয়েছিলেন।

এতকিছু সত্ত্বেও দেবু তান্ত্রিক দমে যাওয়ার পাত্র নয়। প্রবীর ঘোষ নিজের আসল পরিচয় দিলেন। তখনও দেবু তান্ত্রিক বলতে লাগলেন আমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে স্টোন এর রং পাল্টে দেওয়ার। প্রবীর ঘোষ দেবু তান্ত্রিককে বললেন, ''ঠিক আছে। আমি হাতের মুঠোর মধ্যে সাদা স্টোন রাখছি। আপনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করে পাথরের রং পাল্টে লাল করে দিন। যদি পারেন, প্রতিশ্রুতি রইল ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার সাথে সমিতি ভেঙে দেব।''

না, দেবু তান্ত্রিক পাথরের রং পাল্টে দিতে পারলেন না। তবুও বলতে লাগলেন মাদুলিটা কি করে এল, খোল কীভাবে ভাঙল? একটার পর একটা ঘটনার কারসাজি প্রবীর ঘোষ সবার সামনে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আর প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জের সামনে দেবু তান্ত্রিক হেরে ভূত। এখানেই কিন্তু ঘটনা শেষ নয়। প্রবীর ঘোষ কোনও মেক আপ ছাড়াই দেবু তান্ত্রিকের সামনে হাজির হয়েছিলেন টি.ভি. ক্যামেরা নিয়ে এবং নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এর উপর সাতদিন আগেই তারা নিউজে জ্যোতিষ সম্মেলনে জ্যোতিষীদের পালানোর ছবি এবং প্রবীর ঘোষকে দেখাও গেছিল। বোধহয় এই অনুষ্ঠানটি দেবুর স্ত্রী দেখেছিলেন। তাই প্রবীর ঘোষকে দেবু তান্ত্রিকের সামনে দেখে বললেন, ''আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। আপনি প্রবীর ঘোষ না?''

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আমি প্রবীর ঘোষ নই।'' তবুও দেবুর স্ত্রীর মনে একটা খটকা থেকে গেছিল। কিন্তু টি.ভি. ক্যামেরা ও প্রবীর ঘোষের কথার মোহে পড়ে দেবু প্রবীর ঘোষকে চিনেও চিনতে পারলেন না। ফলে নিজের স্ত্রীর কথাও বিশ্বাস করলেন না। তাই শেষ পর্যন্ত যখন দেবু তান্ত্রিক হেরে ভূত বনে গেলেন, ''আমি বলছিলাম না, এ প্রবীর ঘোষ। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না। দেখলে তো কী হাল হল?''—বউয়ের চেঁচামেচি শুরু হল।

প্রবীর ঘোষ মেকআপ ছাড়াই জ্যোতিষী তান্ত্রিককে বিভ্রান্ত করে দেন। ওরা ভাবতে বাধ্য হয়—এ প্রবীর ঘোষ নয়। এইভাবে নাকে খত দিয়ে ছাড়েন। যারা প্রবীর ঘোষের নাম ও ছবির সঙ্গে পরিচিত তাঁদেরই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন তো মেক-আপ দিলে তাঁদের কী অবস্থা হতে পারে। সত্যি এটা প্রবীর ঘোষের পক্ষেই সম্ভব; বিনা মেকআপ-এ শুধুমাত্র বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথাবার্তা পাল্টে ফেলে পরিচিত প্রবীর ঘোষকে মনে হয় এক অন্য প্রবীর ঘোষ।

এ তো গেল দেবু তান্ত্রিকের ভাণ্ডাফোড়ের ঘটনা। কিন্তু আসল ভয়ংকর ঘটনাটা যে সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল তা যখন জানতে পারলাম তখন গায়ে কাঁটা

দিয়ে উঠল। কারণ, দেবু তান্ত্রিকের সামনে হাসিমুখে যেভাবে প্রবীর ঘোষকে দেখেছিলাম, তা অন্য কোনও লোক হলে থাকতেই পারতেন না।

ঘটনাটা হল—দেবু তান্ত্রিকের ভাণ্ডাফোড় করার আগে এক প্ল্যান করা হয়েছিল যে প্রবীর ঘোষ ট্রেনে করে বারাসাত স্টেশনে নামবেন। এবং সেখান থেকে তান্ত্রিকের বাড়িতে যাবেন। কিন্তু সকালে দেখলাম প্রবীর ঘোষ ট্রেনে না এসে গাড়ি করে এলেন। রহস্যটা কী? রহস্যটা হল, সমিতিরই এক সদস্য আশিস প্রবীর ঘোষের খুনের ষড়যন্ত্র করছিল। যেই প্রবীর ঘোষ ট্রেন থেকে বারাসাত স্টেশনে নামবেন তখনই প্রবীর ঘোষকে গুলি করে হত্যা করা হবে। কী ভয়ংকর কথা। এতবড় একটা ঘটনার হাত থেকে কীভাবে প্রবীরদা বেঁচে আমাদের সামনে হাজির হলেন, তা তিনিই জানেন। আর ওই হত্যার ষড়যন্ত্রকারী সদস্যটি পর দিন খুব ভোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচল।

এখানে আমি আমার ডায়রি থেকে কয়েকটি মাত্র দিনের ঘটনা তুলে দিলাম। এগুলো ঘটেছিল আমার সমিতির সঙ্গে যুক্ত হবার পর প্রথম দিকে। এর পর আরও চার বছরের ওপর কেটে গেছে। যত দিন যাচ্ছে তত প্রবীরদার ভক্ত হয়ে পড়ছি; মানুষটাকে কাছ থেকে দেখে তত অবাক হচ্ছি।

একের পর এক বাবাজী-মাতাজী, জ্যোতিষী, তান্ত্রিকের ভাণ্ডাফোড় করার পর সেই সব ভণ্ডরা প্রবীর ঘোষের উপর কেমন হাড়ে চটা হবে তা কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র লোভের কারণে যদি সমিতির লোকও প্রবীর ঘোষকে হত্যার চেষ্টা করে তখন আপনি কী বলবেন? ঘরে ও বাইরে এইভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়েও প্রবীরদা যেভাবে হাসিমুখে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমার কাছে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তি এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি, ‘‘প্রবীর ঘোষ আমার জীবনের আদর্শ।’’

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠী রক্ষার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষের বীজ কৈশোরেই ইতিহাস পাঠকদের মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, রক্তপাত, লুণ্ঠন, হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করেই চলেছে।

হাসপাতালে ভূত

৮ আগস্ট ২০০৭, কলকাতা টিভির ওবি ভ্যান নিয়ে আমি রওনা হলাম : লক্ষ্য পাইকপাড়ার মাতৃসদন হাসপাতাল।

গত বছরখানেক ধরে হাসপাতালে মহিলারা দিনের বেলায় আসেন; কিন্তু সন্ধ্যের আগেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। আর কেউই কোনো প্রসূতিও এই হাসপাতালে রাত্রে থাকতে রাজি নয়; কারণ, ভূতের ভয়। আর ভূতগুলো নাকি আসে সন্ধ্যে হলেই; বেশ গা ছমছম ব্যাপার!

আমরা হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয় হয়। ওবি ভ্যান থেকে লাইভ সম্প্রচার করা হবে টিভি চ্যানেলে। মুহূর্তেই মেলা লোক জুটে গেলো—যত নারী, তত পুরুষ। হাসপাতাল এলাকায় ঢুকতেই দেখলাম আলোর অভাব। বিভিন্ন লাইটপোস্ট আছে, কিন্তু বাল্‌ব ভাঙা। বাল্‌ব কি ভূতেরা ভেঙেছে? এরা কি তবে জ্যান্তভূতের ছানা! থাক্, আমার কাজ সত্যানুসন্ধান। আশপাশটা ঘুরতে গিয়ে দেখলাম হাসপাতাল চত্বরে কয়েকজন লোক জুয়া খেলছে; পাশে এদের বোতল।

ক্যামেরা চালু করতে বললাম। লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন? নাকি হাসপাতালের স্টাফ?'

'তা, রাত্রে আপনারা ডিউটি করেন না?'

'না, আমাদের ডিউটি নেই। পেশেন্ট থাকলে তো ডিউটি করব। পেশেন্ট কোথায়?'—বলল লোকগুলো।

হাসপাতালের সুপারেনটেন্ডেন্ট ডা: ডি. বাসুকে ফোনে ধরলাম। উনিও হাসপাতালে নেই। বললাম, এখানে স্টাফের কেউ থাকে না?

বললেন, না, কেন থাকবে? রাত্রে থাকার জন্য তো কোনো পেশেন্টই আসে না।

বললাম, আপনি কি জানেন, আপনাদের স্টাফেরা হাসপাতাল চত্বরে বসে মদ খায়, জুয়া খেলে?

না—, আমি কি করে জানব? আমি তো থাকিই না।

ফোন করলাম স্বাস্থ্য আধিকারীক সঞ্চিত বক্সিকে। তাঁকে হাসপাতালের বিভিন্ন কর্মকান্ড জানতেই তিনি বললেন, না—, আমি তো কিছু জানতামই না। আপনার থেকেই প্রথম শুনলাম। ঠিক আছে আমি এ-ব্যাপারে একটা এনকোয়ারি করব।

এক-একটা মেটারনিটি ঘর ঘুরলাম, ওটিও দেখলাম। কোথাও আলো জ্বলছে, তো, তাও জ্বলছে না। বাল্‌বগুলো তারা খুলে নিয়ে চলে গেছে। যারা নিয়ে গেছে সরকারের ওপর তাদেরও তো অধিকার আছে; ট্যাক্স দে বলে কথা! তাই নিজেদের শেয়ারের অংশ নিয়ে গেছে।

ওবি ভ্যান থেকে সবই প্রচারিত হচ্ছে। বাইরে তখন কলকাতা টিভি দেখে জনসাধারণ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। যারা মদ খাচ্ছিল ও জুয়া খেলছিল তাদের বললাম, ভাই, এই যে তোমাদের সব অপকর্মের ছবি টিভিতে দেখা যাচ্ছে। জনগণ সব দেখেছে। এরপর তোমরা যদি হাসপাতালে ঢোকো তাহলে জনগণই তোমাদের পেদিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

প্রশাসন যদি হাসপাতাল তৈরি করেই বসে থাকে, তাহলে তো এমন অবস্থা হবেই! মাতৃসদনের মৃত্যু প্রশাসনই ডেকে আনছে। বাইরে যখন বেরিয়ে এলাম, একটা পুলিশ ভ্যান, প্রচুর পুলিশ ভিড় সামাল দিচ্ছে।

জনগণের উদ্দেশ্যে বললাম, হাসপাতাল চত্বর অন্ধকার বলে ভূত আছে। আলো থাকলে ভূত থাকে না। ভূতের গুজবটা ফাঁকিবাজ কর্মচারী, মাতাল চাতাল জুয়োখোর মদখোররাই প্রচার করেছে। আপনারা সবাই রুখে দাঁড়ান, দেখবেন ভূত সব পালিয়ে গেছে। কেউ যদি ভূত দেখাতে পারেন বা ভূতুরে কান্ড ঘটিয়ে দেখাতে পারেন তাহলে তাকে দেবো ২৫ লক্ষ টাকা, হ্যায় কিসিকা দম।

নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের লড়াইতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার পুরোটা যেহেতু ধনী হুজুরের দলই জোগায় তাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলকারী রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রশক্তি হয়ে দাঁড়ায় ধনীদের বিশ্বস্ত 'যো-হুজুর'-এর দল।

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন ওইসব তথাকথিত অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতারা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদ বিরোধী চরমবাস্তববাদী। 'ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবেই' বলে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দলই নির্বাচনের লড়াইতে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না।

পেঁয়াজ ভূত নিয়ে গুজব

২০০৭ সালের এপ্রিলের ঘটনা। 'মোবাইল ভূত', 'লাইট ভূত', 'অদৃশ্য মানুষ' ইত্যাদি ভূতের গুজব শুনেছিলাম। বছর দশেক আগে 'পেঁয়াজ ভূত'-এর গুজব ছড়িয়েছিল বিশাল করে। মূলত উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে।

গুজবটার গল্প :

এক ভিখারী বুড়ি বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিছু খেতে চাইছে—পেঁয়াজ লঙ্কা সহযোগে একটু ভাত। ভিক্ষা পাওয়া পেঁয়াজ লঙ্কা ও ভাতের মধ্যে শুধু পেঁয়াজটাই খাওয়া শুরু করতো বুড়ি। স্বাভাবিক কারণেই বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো—কি গো বুড়িমা তুমি শুধু শুধু পেঁয়াজ খাচ্ছ কেন?

বুড়ি উত্তর দিত—'শুধু পেঁয়াজ খাব কেন? আমি তো তোর ব্যাটার মাথা কামড়ে চিবিয়ে খাচ্ছি।' কথা শেষ হতেই বুড়ি অদৃশ্য। বাড়ির লোকেরা হুড়োহুড়ি করে ঘরে ঢুকে দেখত ছেলেটা মারা গেছে।

গল্পটা এখানেই শেষ নয়। গুজব ছিল—বড় আকারের পেঁয়াজ দিলে বড় ছেলে মারা যেত; মাঝারি পেঁয়াজে মেজ ছেলে এবং ছোট পেঁয়াজে ছোট ছেলে মারা যেত। এই ভূতের গুজবে বিশ্বাস করেছিল শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী গরিব সব শ্রেণির লোক। পেঁয়াজ ভূতের হাত থেকে বাঁচতে নিজেদের বাড়ির দেওয়ালে বা সদর দরজায় আলতা বা গোবর দিয়ে লিখে রাখত 'ওঁ' বা 'ওঁ মা'। কেউ কেউ সাদা কাগজে লালকালিতে লিখে দিত—'ওঁ'। তারপর সেই কাগজ সেঁটে দিত দরজায়। তাদের বিশ্বাস—পেঁয়াজভূত আর তাদের দরজায় আসবে না, মৃত্যুও হানা দেবে না তাদের বাড়িতে।

এই গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার দায়িত্ব নিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সমিতির সাধারণ সম্পাদক তখন প্রবীর ঘোষ। তিনি যুক্তিবাদী সমিতির সমস্ত শাখা থেকে অন্তত একজন করে প্রতিনিধি স্টাডি ক্লাসে পাঠাতে বললেন। স্টাডি ক্লাসে তিনি নির্দেশ দিলেন প্রত্যেকটা শাখা থেকে একটা করে দল গঠন

করতে। তাদের কাজ হবে ওই অঞ্চলে বা তার আশেপাশে 'পেঁয়াজ ভূতে'র গুজব কতটা প্রভাব ফেলেছে তার অনুসন্ধান চালানো। লিখিতভাবে নোট নিতে হবে। নির্দেশমতো সন্তোষ শর্মার ওপর দায়িত্ব পড়ল জাফরপুর ও মোহনপুর গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান চালানোর। ওই অঞ্চলে যে-সব বাড়ির দেওয়ালে বা দরজায় 'ওঁ' বা 'ওঁ মা' লেখা থাকত, সেসব বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতো—আপনারা দেওয়ালে 'ওঁ' লিখেছেন কেন? উত্তরে প্রত্যেকেই জানিয়েছিল—পেঁয়াজ ভূতে হাত থেকে বাঁচতে।

প্রথম প্রথম কয়েকজন উত্তর দিয়েছিল 'পেঁয়াজ ভূত'কে দেখেছে। পাল্টা প্রশ্ন—'আপনাদের বাড়িতে ভাত পেঁয়াজ—এইসব খেয়েছিল? 'বুড়ির কেমন বয়স? কী রঙের শাড়ি পরেছিল?' কেউ উত্তরে যদি জানাতো সাদা থান বা সাদা কাপড় পরা, তাহলে তাকে বলা হতো—নাহ, অন্য জায়গাতে তো লাল কাপড় দেখেছে। আপনি কেন সাদা দেখলেন? বাড়ির লোকটি আমতা আমতা করে বলতো—'না—আমি তো দেখিনি, তবে আমার খুব চেনা এক বন্ধু দেখেছে।' বা আত্মীয় দেখেছে বলতো তারা।

আবার কেউ কেউ বলতো—'আমরা লিখিনি, কে যেন লিখে দিয়ে গেছে।'

পাল্টা যখন বলা হতো—তাহলে নিশ্চয় গুজবটাতে বিশ্বাস করেন না। 'ওঁ' লেখাটা মুছে দিন না?

'না-না, লেখা আছে থাক না। লেখা থাকলে ক্ষতি তো কিছু হবে না।'—বলতো তারা। এতেই আসল সত্যিটা বোঝা যেত যে, 'পেঁয়াজ ভূত'-এর গুজবটাতে বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, আঙুলে গ্রহরত্নের আংটি পরে অনেকে বলে—'এ-ই মা দিয়েছেন তাই পরেছি। পরলে ক্ষতি তো নেই। আমি ওসবে একদম বিশ্বাস করি না।' বা অনেকে বলে—'এটাও অলংকারেরই মতো। পরলে ক্ষতি তো নেই। তাই পরে আছি।'

কেউ কেউ আবার জবাব দিয়েছে—'এ-ই—প্রতিবেশি বলছিল, তাই লিখে রেখেছি। লিখে রাখলে ক্ষতি তো নেই।'

সমিতির ছেলেমেয়েরা যখনই বলেছে—আপনারা যখন ভূতটুতে বিশ্বাস করেন না, তাহলে এসব গুজবকে তোল্লাই দিচ্ছেন কেন? আমরা আপনাদের ওই 'ওঁ' লেখাটা কালি বুলিয়ে মিটিয়ে দিচ্ছি।

উত্তরে অনেকেই জানিয়েছে—'না, আপনাদের মুছতে হবে না। লেখা আছে থাক। লেখা থাকলে ক্ষতি তো নেই!'

রবিবার, ৬ মে, ২০০৭ :

বেশ বড়ই মিছিল বেরোলো যুক্তিবাদী সমিতির সোনারপুর শাখার তরফ থেকে। মিছিলের লোকের হাতে পোস্টার, ব্যানার। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে হাজির ছিলেন, চৈতালী, মানসী, মৃণাল, অজয়, অতীশ, দেবু, সুমন দাঁ, সন্তোষ শর্মা সহ আরও কয়েকজন অংশগ্রহণ করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করে জানাল যে, ভূত বলে কিছু নেই। অলৌকিক ঘটনা বলে কিছু হয় না। কেউ যদি ভূত দেখাতে পারে বা ভৌতিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারে তাহলে তাকে দেওয়া হবে ২৫ লক্ষ টাকা। আমি বললাম, কেউ যদি 'পেঁয়াজ ভূত' এনে দেখাতে পারে তাহলে সেই ভূতকে বা বুড়িকে আমিই পেঁয়াজ দেবো; আমার ছেলে যদি একদিন পরেও মারা যায় তাহলেও তাকে দেবো ২৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও যদি কেউ কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে তাকে দেবো ২৫ লক্ষ টাকা। এই যে আপনাদের ভূতে বিশ্বাস, তা শিশুমনে প্রভাব ফেলে। শিশু থেকেই সেই ভয় হয়েও থেকে যায়। মনে আলো আনুন দেখবেন ভূতের ভয়ের অন্ধকার দূর হবে।

নির্বাচনী ব্যয়ের শতকরা ৯৯ ভাগেও বেশি টাকা জোগায় ধনকুবেররা। বিনিময়ে তারা এইসব দলগুলোর কাছ থেকে পায় স্বস্তিতে শোষণ চালাবার গ্যারান্টি। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো কৌশল হিসেবে খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে নির্বাচনী তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় করে দেখাতে চায় "মোরা তোমাদেরই লোক।"

রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শনের সঙ্গে আচরণের মধ্যে যে অসংগতি তাই হল দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অভ্যাস-যা মূল্যবোধকে ধ্বংস করার পক্ষে পারমাণবিক বোমা।

ভূত পোষার শাস্তি থেকে যুক্তিবাদীরা দিল মুক্তি

সন্তোষ শর্মা

বুধবার ২৭ আগস্ট ২০০৮

ভূত বলে কিছুই নেই। কিন্তু এই ভূতের নামে একটি পরিবারদের ছয় মাস ধরে সামাজিকভাবে বয়কট করে রাখা হয়েছে। বাড়িতে 'ভূত পোষার জন্য পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি থানার ভীমশোল গ্রামের। এই গ্রামের মালিক মাহাতো পরিবারকে 'ভূত পোষা'র জন্য সামাজিক ভাবে বয়কট করে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনের কাছে আবেদন করা সত্ত্বেও মাহাতো পরিবার আজ পর্যন্ত কোনও সুরাহা পায়নি। শেষপযন্ত মাহাতো পরিবার 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' এবং 'হিউম্যানিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশন'-এর কাছে লিখিত আবেদন করে সামাজিক বয়কট থেকে মুক্তির অনুরোধ করেন।

এই পুরো ঘটনাটি যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ আমাকে বলেন। তিনি বলেন, ''তুমি ও সুমন দাঁ শালবনীর ভীমশোল গ্রামে যাবে। ওখানে অনিন্দ্যসুন্দর মন্ডল তোমাদেরকে সাহায্য করবে। ভীমশোল গ্রামে তোমরা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করবে। গ্রামের লোকেদের বোঝাবে যে ভূত বলে কিছুই নেই। ওঝাতান্ত্রিক-জানগুরুর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আমার ২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ জানাবে।''

বৃহস্পতিবার ২৮ আগস্ট ২০০৮

''ভীমশোল গ্রামের মাহাতো পরিবারকে সামাজিক ভাবে মিথ্যে ও কাল্পনিক ভূতুড়ে ঘটনার ভিত্তিতে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন এই ঘটনার কেন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না? কেন জানগুরুকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? জানগুরুকে যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ জানান হচ্ছে।''

এই কথাগুলো যুক্তিবাদী সমিতির মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক অনিন্দ্যসুন্দর মন্ডল বিভিন্ন মিডিয়াকে সাক্ষাৎকারে বলেছে।

শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০০৮

হিউম্যানিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর-এর জেলাশাসক এবং ৭ নম্বর সাতপাটি গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিত আবেদন করা হয়। আবেদনে যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জের করা উল্লেখ করা হয়। সমিতি ভীমশোল গ্রামে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে। তার জন্য ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান হয়।

সোমবার ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮

অনিন্দ্যসুন্দর আমাকে জানাল, ''আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান ভীমশোল গ্রামে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে আমাদের সমিতিকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।''

অনিন্দ্য আরও জানাল, ''আমার দেওয়া সাক্ষাৎকার 'আকাশ বাংলা', 'আর-প্লাস' প্রচার করেছে। ভীমশোল গ্রামে 'ভূত পোষার শাস্তি'-র খবরে আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জসহ 'বর্তমান'-এর খবর প্রকাশিত হয়েছে।''

বুধবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সকালে অনিন্দ্য জানাল, ''সাতপাটি গ্রামপঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ভীমশোল গ্রামে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করার জন্য বলেছেন। আমরা বৃহস্পতিবার ঐ গ্রামে যাবো। তোমরা মেদিনীপুরে চলে এসো।''

প্রবীর ঘোষের কথামত আমি ও সুমন দাঁ হাওড়া স্টেশন হয়ে মেদিনীপুরে পৌঁছালাম। এখানে অনিন্দ্য একটি বাড়িতে পেইংগেস্ট হিসাবে থাকে।

আজ 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ একটি খবর প্রকাশিত হয়। 'বাড়িতে ভূত পোষার অভিযোগে ৬ মাস সামাজিক বয়কট'। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক অনিন্দ্য জানায়, ''ভূত বলে কিছু নেই। গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা করছে জানগুরু। কাল যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা ভীমশোল গ্রামে যাবেন।''

বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সকালে ভীমশোল গ্রামে রওনা হওয়ার আগে আমরা অনিন্দ্যর পেইংগেস্ট হাউসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। খাওয়ার সময় বাড়ির মালিক এবং অন্যান্য মহিলারা আমাদের বললেন, ''শুনেছি তোমরা আজ ভীমশোল গ্রামে যাচ্ছো? বলছি তোমরা ওখানে যেও না। এখানে অনেক বিপদ আছে। তোমরা কলকাতার শিক্ষিত ছেলে। তোমাদের কিছু হলে তোমাদের মা-বাবার অনেক কষ্ট হবে।''

আমি বললাম, ''কাকিমা, চিন্তা করবেন না। প্রবীর ঘোষ যখন আমাদের এতদূরে পাঠিয়েছেন তখন উনিই আমাদেরকে নিয়ে সব থেকে বেশি চিন্তিত।''

আমি, সুমন, অনিন্দ্য সহ আটজন মেদিনীপুর শহর থেকে একটি বাসে উঠলাম। কয়েক ঘন্টার পর আমরা শালবনি থানা এলাকায় ৭ নম্বর সাতপাটি গ্রাম পঞ্চায়েত-এ পৌঁছালাম। সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি বাস্কে এবং উপ-প্রধান পরিমল ধরএর সঙ্গে আমরা দেখা করলাম।

যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা আজ ভীমশোল গ্রামে 'ভূত পোষার' ঘটনার সমাধান করার জন্য যাচ্ছেন। এই খবর বিভিন্ন মিডিয়াতে আগেই প্রচার করা হয়েছিল। তাই আজ আমাদের সঙ্গে ভীমশোল গ্রামে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা এই পঞ্চায়েতে হাজির হয়েছেন।

পঞ্চায়েত-এর তরফ থেকে আমাদের জন্য একটি মারুতি ভ্যানে করে সবাই ভীমশোল গ্রামে পৌঁছলাম। আমাদের গাড়ি মানিক মাহাতোর বাড়ি থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরে ছিল। তখনই অনিন্দ্য গাড়ি থামাতে বললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''গাড়ি এখানে থামালে কেন?'' অনিন্দ্য বললো, ''ভূত পোষা অভিযোগে মানিক মাহাতো পরিবারকে প্রায় ৬ মাস ধরে গ্রামবাসিরা সামাজিক বয়কট করে রেখেছে। এমন অবস্থায় মাহাতোর বাড়িতে গেলে সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া ভূতের ভয়ে গ্রামের কোনও মানুষ মাহাতোর বাড়ির সীমানা দিয়ে যেতেও ভয় করে। এমন অবস্থায় আমাদের মাহাতোর বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাদের এখানেই 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করতে হবে।''

আমি বললাম, ''যে মাহাতো পরিবারের সামাজিক বয়কটের সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছি। এখন মাহাতো পরিবারের সঙ্গে আমরা যদি দেখা না করি। তাহলে সমস্যা তো সমস্যাই থেকে যাবে। আমিও সুমন মাহাতোর বাড়িতে যাচ্ছি। দেখি কি হয়। মাহাতোর বাড়ির সামনেই অনুষ্ঠান করবো।''

শেষ পর্যন্ত অনিন্দ্য আমার কথায় রাজি হল। আমরা সবাই দলবেঁধে মানিক মাহাতোর বাড়িতে গেলাম। মাটির বাড়ি। টালি ও খড়ের চাল দেওয়া। আমরা মানিক মাহাতো, ওনার ছেলে রমেশ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে দেখা করি এবং কথা বলি।

ভীমশোল গ্রামে মোট ৪৭টি পরিবারের মধ্যে ৪০টি আদিবাসী এবং ৭টি মাহাত পরিবার। মানিকবাবুর ছেলে রমেশ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। রমেশ ও মানিক দুজনে মিলে তাদের ১০ বিঘা জমিতে চাষ করেন। রমেশ বলেন, ''বিভিন্ন চাষবাসের বইপত্র পড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করায় বেশি ফসল হওয়ায় গ্রামের মানুষ ঈর্ষান্বিত। গ্রামের বাকি ৪৬ পরিবার সেই কারণে আমাদেরকে 'ভূত পুষে' রাখার অভিযোগে বয়কট করে রেখেছে। গ্রামবাসীদের ধারণা চাষে অধিক ফলন কিংবা আমাদের পরিবারের সামগ্রিক সমৃদ্ধির পিছনে কোন ভূত বা অলৌকিক

শক্তির হাত আছে। এই কারণ খুঁজতে স্থানীয় গুণিনদের পাশাপাশি গ্রামের প্রতিটি পরিবারের একজন করে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রাংপুর থানার পটিপুর গ্রামে বিধাতাসম জানগুরুর কাছে যাই। জানগুরু উপস্থিত গ্রামবাসীদের হাতে সরষে তেল দিয়ে গণনা শুরু করেন। গণনার সময় আমার হাতে তেলের উপর একটা চুল পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে 'ভূত পুষে' রাখার অভিযোগ দেওয়া হয়। তারপর থেকে গ্রামবাসীরা আমাদের সামাজিক বয়কট করে রেখেছে।"

পুরো ঘটনাটি শোনার পর আমরা মানিকবাবুর বাড়ির সামনে একটি ছোট বাঁশঝাড়ের আমাদের 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'যুক্তিবাদী সমিতির' ব্যানার টাঙিয়ে দিলাম। মানিকবাবুর ঘর থেকে চেয়ার টেবিল আনা হল। ওনার ঘরে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানের সামগ্রী রাখলাম। রমেশকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বললাম।

গ্রামপঞ্চায়েত-এর তরফ থেকে মাইক ও মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করে দিল। আমরা অনুষ্ঠান শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে মানিকবাবুর বাড়ির সামনে অনুষ্ঠান দেখার জন্য ৮ থেকে ৮০ বছরের গ্রামের লোকেরা গুটি-গুটি পায়ে ভিড় জমাতে লাগলেন।

ওঝা, জানগুরু কাউকে ডাইনি চিহ্নিত করতে বা ভূত পুষে রাখার জন্য যেসব কান্ডকারখানা করে দেখায় আমরা যুক্তিবাদীরা একটার পর একটা করে দেখাতে লাগলাম। এবং তার পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিতে শুরু করলাম। মন্ত্র পড়ে কয়লায় জল দিয়ে আগুন জ্বালান। জলে আটার গুলি ভাসানো ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের মাঝে এক সাংবাদিক বন্ধু এসে আমাকে বললেন, ''আপনারা এই গ্রামে অনুষ্ঠান করতে এসেছেন। এই খবর গ্রামের মস্তান-মাতব্বরদের কানে চলে গেছে। তাঁরা যে কোনও সময় আপনাদের উপর হামলা করতে পারে। কারণ এই মাতব্বররাই মানিক মাহাত পরিবারকে 'ভূত পোষা'র অভিযোগ দিয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে রেখেছে। স্থানীয় পিড়কাঁটা ফাঁড়িতে আমরা আগে থেকে খবর দিয়ে রেখেছি। পুলিশ ফোর্স রেডি আছে। খবর দিলেই পুলিশ এখানে চলে আসবে।"

আমি বললাম, ''আপনি পুলিশকে এখানে আসার জন্য খবর দিয়ে দিন।"

এদিকে আমাদের 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে উঠেছে। উপস্থিত দর্শক গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তুললেন, ''যে জানগুরু মানিক মাহাত পরিবারকে 'ভূত পোষা'র জন্য শাস্তি দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আপনারা কিছু করতে পারবেন?"

আমরা যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের ২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ-এর কথা উল্লেখ করে বললাম, ''যদি কোনও ওঝা, জানগুরু আমাদের এই মঞ্চে এসে তার 'অলৌকিক' ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তাকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।"

এর মধ্যেই পিড়কাঁটা ফাঁড়ির আইসি অভিজিৎ বিশ্বাস-এর নেতৃত্বে এক বিশাল

পুলিশ ফোর্স আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে উপস্থিত হল। পঞ্চায়েত প্রধান আরতি বাস্কে এবং উপপ্রধান পরিমল ধরও অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে বসলেন।

আমাদের অনুষ্ঠান চলতে লাগলো। আমরা বললাম, ''ভূত বলে কিছু হয় না। যে যত বড় 'অলৌকিক' ক্ষমতার দাবিদার, সে তত বড় প্রতারক। ওঝা-তান্ত্রিক এক-একটা বুজরুক। যদি কোনও ওঝা-তান্ত্রিক আমাদের সামনে অলৌকিক ঘটনা বা ভূত হাজির করতে পারে তাহলে তাকে যুক্তিবাদী সমিতি ২৫ লক্ষ টাকা দেবে।''

শেষ পর্যন্ত উপস্থিত গ্রামবাসীরা বলতে লাগলেন, ''আপনারা এই অনুষ্ঠানে যে সব ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়েছেন, সেইভাবে ওঝা-জানগুরুরাও ঘটিয়ে দেখায়। ওঝা-জানগুরু প্রতারক। আমাদের ঠকিয়েছে। এই প্রতারক ওঝা-জানগুরুদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা?''

আমরা বললাম, ''দি ড্রাগ্স এন্ড কসমেটিকস্ এ্যাক্ট ১৯৪০-এর অনুসারে অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা কোনোও সমস্যার, রোগের ইত্যাদি ঠিক করে দেওয়ার দাবি করা আইনত দন্ডনিয় অপরাধ। আপনারা ঐ ওঝা-জানগুরুর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করুন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো।''

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে গ্রামপঞ্চায়েত-এর প্রধান ও উপপ্রধান বললেন, ''যুক্তিবাদী সমিতিকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাদের এই ভীমশোল গ্রামের মানুষের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস দূর করেছেন। ভূত বলে কিছুই হয় না। জানগুরুরা প্রতারক। মানিক মাহাত পরিবারের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি মাহাত পরিবারের সমস্যা আমরা গ্রামের লোকেরা বসে সমাধান করে নেব। আজ থেকে মানিকবাবু ও তার পরিবার আমাদের গ্রামের একজন হয়ে গেলেন।''

এই শুনে গ্রামবাসীরা খুশিতে হাততালি দিতে লাগলেন। মানিকবাবু আমাদেরকে বললেন, ''আপনারা আজ আমাদের কত বড় উপকার করেছেন। কত বড় বিপদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়ার শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না।''

মানিকবাবুর ছেলে রমেশ আমাকে বললেন, ''আমার মনে একটা ভয় এখনও করছে। কারণ যে মাতব্বররা আমাদের পরিবারকে সামাজিক বহিষ্কার করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল, সেই মাতব্বরের নেতা এখানে এসেছে। ওর বিরুদ্ধে কিছু একটা করুন। কারণ ভয় হচ্ছে, আপনাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার পর ঐ মস্তানরা আমাদের পরিবারের উপর হামলা করতে পারে।''

আমি পিড়কাঁটা ফাঁড়ির আইসি অভিজিৎবাবুকে রমেশ-এর কথা বললাম। এরপর আইসি ঐ মাতব্বরের নেতাকে নিজের কাছে ডাকলেন। এবং প্রচন্ড ধমকের সুরে বললেন, ''এই তো সন্ডা মার্কা চেহারা। শুনেছি গ্রামের বড় মস্তান হয়েছিস। এই যে কলকাতা থেকে শিক্ষিত যুবকরা এই গ্রামে এসেছেন। অনুষ্ঠান করে

যুক্তিবাদীরা গ্রামের লোকেদের বললেন, ভূত বলে কিছু হয় না। এর পরেও কি তোর চোখ খোলেনি? এরপর যদি শুনেছি মানিক মাহাত পরিবারকে সামাজিক বয়কট বা খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাহলে তোকে ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন প্যাদাবো, দেখবি ভূত কাকে বলে।"

মস্তানি মার্কা ছ-ফুট লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে বললো, ''এবার থেকে গ্রামের আর কারও উপর অত্যাচার হবে না। কথা দিচ্ছি স্যার।"

শুক্রবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'ভূত পোষা'র শাস্তি ছ-মাস ধরে পরিবারকে বয়কট শালবনিতে এই খবরটি আমাদের ভীমশোল গ্রামে অনুষ্ঠানের ছবিসহ প্রকাশিত করল। বর্তমান-এ শালবনিতে পরিবারের উপর সামাজিক বয়কট তোলার উদ্যোগ খবর প্রকাশ করলো।

মঙ্গলবার ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮

আমাদের কথামত ভীমশোল গ্রামবাসীরা ওড়িশার ঐ জানগুরুর বিরুদ্ধে পিড়কাঁটা ফাঁড়ি এবং শালবনি থানাতে এফআইআর দায়ের করেছেন। পুলিশ কথা দিয়েছে, ''যখনই ঐ জানগুরু ভীমশোল গ্রামে আসবে, তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।"

**মৌলবাদ একটা বিশ্বাসের ব্যাপার, ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস।
রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডই এমন ধর্মীয় অন্ধ
বিশ্বাসকে আরও বেশি জোরদারই করছে,
আরও ব্যাপকতর অংশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।**

**সেকুলার রাষ্ট্রে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের
ব্যাপার হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে
এই ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস যেন প্রকাশ্যে না
এসে পড়ে এ বিষয়ে অতি সতর্ক থাকা
'সেকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ'
রাষ্ট্রের কর্তব্য।**

কোতুলপুরের সেই স্কুলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

আলোক সেন

কোতুলপুর থানার মির্জাপুর হাইস্কুলে গত তিনদিন ধরে চলা ভূত-আতঙ্ক ঘোচাতে সোমবার ওই স্কুলে যায় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির জেলা শাখার একটি দল। দলটির সদস্যরা বিজ্ঞানভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভূত-আতঙ্ক ঘোচানোর চেষ্টা করেন। স্কুলের প্রায় হাজারখানেক ছেলেমেয়ে সেই অনুষ্ঠান দেখে। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। কথা বলে তাঁদের মনে হয়েছে, দুঘন্টার সেই অনুষ্ঠান দেখে তাদের মধ্যে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকটাই ঘুচে গেছে। কেউ কেউ ওই ভুল ধারণাকে বিশ্বাস করেছিল বলে নিজেরা লজ্জিত, সে কথাও জানিয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে, এই ধরনের মিথ্যা গুজবকে তারা আর কোনওমতেই প্রশ্রয় দেবে না।

ওই স্কুলে এদিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন ব্লকের বিডিও, থানার ওসি, সর্বশিক্ষা মিশনের কোঅর্ডিনেটর, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, পাশের একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রমুখ। যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য অনিকেত রায় বলেন, তাঁরা স্কুলে গিয়ে প্রথমে জানার চেষ্টা করেন কীভাবে এই গুজব ছড়াল। তাঁরা জানতে পারেন, ওই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির একটি ছাত্রী প্রথম আতঙ্কিত হয় ও সে কথা সে স্কুলের অন্য বন্ধুদের বলে। এভাবেই গোটা স্কুলে আতঙ্কটি ছড়িয়ে পড়ে। এদিন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা ওই স্কুলে যাওয়ার পর একটি ছাত্রী অনুরূপভাবে আতঙ্কিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনিকেত জানান, তাঁরা ওই ছাত্রীর সঙ্গে পরে কথা বলে জেনেছেন, গত তিনদিন ধরে ভূত নিয়ে নানা আলোচনা থেকেই তার মনের মধ্যে ভয় দানা বাঁধে। ওই ছাত্রীটির বাড়িতে গিয়েও তাঁরা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, একেবারে নিম্নবিত্ত ও অশিক্ষিত পরিবার থেকে আসার কারণেও ভূত-ভীতি তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। প্রথম যে ছাত্রীটি আতঙ্কিত হয়েছিল, তাঁরা সেই ছাত্রীর বাড়িতেও খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, তাকে তার মা-বাবা বাসুদেবপুরের এক গুনিরে কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই গুনিন তাঁদের ভুল পথে চালিত করে। গুনিনের দাবি, কয়েক দিন আগে যে ছাত্রটি আত্মহত্যা করেছে, তার আত্মা ওই বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেই কারণেই এমন সব ঘটনা ঘটছে। অনিকেত জানান, ওই গুনিনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

যুক্তিবাদীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে

প্রবীর ঘোষ

এখন এই বাংলায় উৎসবের রমরমা। যে কোনও পুজো নিয়ে যে ধরনের মহোৎসব পশ্চিমবাংলাতে হয়—সে গণেশ পুজো থেকে শুরু করে সব পুজোয় এখন উৎসব। শুনছি দুর্গাপুজো এখন মহালয়া থেকেই শুরু হবে। অর্থাৎ এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে, যেন পুজো করলেই অনেক টাকা, পুজো করলেই ভালো ফান্ড—এই প্রভাবগুলো তো সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়ছে এবং পড়তে বাধা। তাই মানুষের অবিশ্বাস বাড়ছে। কিন্তু সত্যিই কেউ যদি অলৌকিক কোনও ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারে, বা কেউ যদি জ্যোতিষ 'বিজ্ঞান'—এটা প্রমাণ করতে পারে, আমি তিনজন লোকের হাত দেখতে দেব একঘন্টা করে, এরপর তিনটে চারটে সহজ প্রশ্ন দেব—আয় কত, বিয়ে হয়েছে, কি হয়নি, হ্যাঁ-না দিয়েই প্রশ্ন উত্তর থাকবে, যদি কোনও জ্যোতিষ উত্তর সঠিক দিতে পারেন, তাঁকে ২৫ লক্ষ টাকা দেব, যিনি এই চ্যালেঞ্জটা নেবেন, তাঁকে আমরা পুরস্কৃত করব। হাতে আংটি পরে ভাগ্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তা হলে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে কে? ঈশ্বর, না গ্রহ। গ্রহ যদি ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তবে ঈশ্বরের কোনও অবদান নেই। তাহলে যারা আংটি পরেন, তাঁরা পুজো-আচ্চা করবেন না, ডাক্তারের কাছে যাবেন না। যা পূর্ব-নির্ধারিত সেটা হবেই, তবে, কেন সেজন্য পুজো আচ্চা করবেন? যদি কেউ বিশ্বাস করেন ভগবানই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন, তা হলে তারও উচিত, ভগবানে আস্থা রেখে কোনওরকম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য না নেওয়া।

আর এখন বহু মানুষ নুন পোড়া, জল পড়া খান এবং তাতে রোগও সারে। সত্যিই সারতে পারে, আবার নাও সারতে পারে। এগুলো, 'মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ'। শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা, মাথাযন্ত্রণা, পেটে ব্যথা, হজমের সমস্যা ইত্যাদিতে নুন পড়া, জল পড়া, তেল পড়া বা কোনও মন্দিরে হত্যে দিয়ে থেকে যে কোনও জিনিস বিশ্বাসের সঙ্গে খেলে সেই সমস্ত রোগ সেরে যাবে। এই জিনিসগুলির ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকলে এইসব জিনিস খেলে রোগ সেরে যেতে পারে, সম্পূর্ণটা মানসিক ব্যাপার।

তবে এত কিছু সত্ত্বেও দিন দিন যুক্তিবাদীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। মানুষ এখন প্রচুর সচেতন হচ্ছেন। শেষ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী যুক্তিবাদীদের সংখ্যা

প্রায় ২২ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে, খ্রিস্টানদের পরেই পৃথিবীতে এদের স্থান, যেটা হিন্দুদের থেকেও বেশি। আগে যে পরিমাণ ডাইনি হত্যার ঘটনা ঘটত। আজ সেটা প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ডাইনি বলে যে কিছুই হয় না, সেটা নিয়ে প্রচার, আন্দোলন করেছি, তাই এই সাফল্য।

আর আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল রাজনৈতিক দল এবং নেতানেত্রীরা। আমাদের দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, ২৯-এ ধারা অনুযায়ী কোনও রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী, আমলা, নেতা কোনও প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ করবে না। কিন্তু কে এই অবিশ্বাস ঠেকাতে অভিযোগ জানাবে? কারণ, অভিযোগ করলে রাজনৈতিক নেতানেত্রী বা দলগুলোর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

লেখক সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

যখনই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন বিশাল হয়ে হাজির হয়েছে, তখন আমাদের সরকার রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটিকেও বিচার করেছে দলীয় স্বার্থের কথা ভেবে, ভোটের কথা ভেবে।

আদর্শের বারুদে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় নিজের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু শরীরও। এমন আদর্শে নিবেদিত প্রাণ সারা শরীরে বারুদ ঠাসা মানুষ ইতিহাসের পাতা থেকে হঠাৎ উঠেড আসে না। এরা তৈরি হয়। আদর্শ এদের তৈরি করে।

দমদমের শেঠবাগানে ভূত

৩ জুলাই, ২০১৭, একজন শীর্ণ ৪৬/৪৭ বছরের ব্যক্তি আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির; সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী ও একটি কিশোর।

ওই ব্যক্তি বললেন, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর শেঠবাগানের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। ফ্রিজ, কাঠের আলমারি, আলনা, ঠাকুরের আসন সব নিজে থেকেই দুমদাম করে পড়ে যাচ্ছে। মোবাইল সেট ছিটকে পড়ে ভেঙে চৌচির। কাঠের আলমারি, তাতে হঠাৎ আগুন ধরে গেলো। একদিন স্ট্যান্ড ফ্যানটা ঠাকুরের আসনে ধুম করে পড়ে গেলো। টিভিটা পড়ল আপনা থেকে এবং ভেঙে চুরমার।

ছেলেটির নাম ধরে নিন গৌতম। স্ত্রীর নাম ধরে নিন মঞ্জু। তিনজনের পরিবার সরু একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে তিন ভাই একটা করে ঘর পেয়েছে। ছেলে উচ্ছল দমদমে কুমার আশুতোষে পড়ে, ক্লাস টেনের ছাত্র।

ওই ভৌতিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তাঁরা চলে গেলেন দমদম ক্যান্টনমেন্টে শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে মাসখানকে নিরুপদ্রবে কাটল। তারপরে যে-কে—সেই—! দুদিন জামা কাপড়ে আগুন লাগল। এদিক ওদিক ছিটকে গেলো জিনিসপত্র। অগত্যা ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে।

এইবার ছেলেকে একদিন টিউশন পড়াতে যাচ্ছেন সাইকেলে। হঠাৎ সাইকেল কেঁপে উঠল। পেচনে ক্যারিয়ারে বসা ছেলে বলে উঠল, ঠিকমতো সাইকেলটা চালাতে। কারণ ছেলের মনে হচ্ছে কে যেন সাইকেলটা ধাক্কা মারছে। অগত্য আর না এগিয়ে বাড়িতে ফিরতে হলো দুজনকে।

একদিন উচ্ছল ডাইনিং-এ দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছিল। হঠাৎ ওকে কে যেন ধাক্কা দিল, অমনি কাঁচের গ্লাস মেঝেতে পড়ে খানখান; আর উচ্ছল ছিটকে গেলো কিছু দূরে। আবার একদিন উচ্ছল ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তারামা-এর ফটো দেওয়াল থেকে খসে পড়ল। সে নিজেও ছিটকে গেল কিছু দূরে।

আমি বললাম, আপনার মুখের কথায় আমি কোনো সত্যানুসন্ধানে যেতে পারি না। লিখিতভাবে আমাদের সমিতিকে আবেদন করলে আমরা আপনাকে ফোনে জানিয়ে তারপর যাব; আবেদনপত্রের সঙ্গে আপনার ভোটার আইডি-র একটি জেরক্স কপি পাঠিয়ে দেবেন।

পরের দিনই উনি লিখিত আবেদনপত্রটি দিয়ে গেলেন। প্রতিটি পাতায় গৌতম কুন্ডুকে দিয়ে সই করিয়ে আবেদনপত্রটি গ্রহণ করলাম।

১৫ জুলাই আমি ও অরিন্দম গেলাম শেঠবাগানে। সঙ্গী হলেন ইটিভি বাংলা চ্যানেলের 'Charge Sheet' অনুষ্ঠানের প্রযোজক শঙ্কু সাঁতরা ও এক ফটোগ্রাফার।

লীলা সিনেমা হলের কাছে বাবা ও ছেলে অপেক্ষা করছিলেন। ওরা সাইকেলে এগোতে লাগলেন; আমরাও ওঁদের পিছু পিছু অনুসরণ করতে লাগলাম। অনেকটা পথ সরু সরু গলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গাড়ি থামল; কারণ গাড়ি চলার মতন আর সামান্য পরিসরও নেই।

উঁচু উঁচু ধাপের সরু সিঁড়ি—দেড় ফুটের বেশি চওড়া নয়। দিনের বেলাতেও অন্ধকার ঘুটঘুটে। তিনতলায় উঠে দেখলাম, তিনটে ছোট্ট ছোট্ট ঘর—আট ফুট বাই আট ফুট হবে। এরই এক একটা করে ঘর গৌতমবাবুদের এক এক ভাইয়ের। ঘরে ঢোকার আগেই স্থানীয় কিছু মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা যেমন এই ঘটনার কথা জানেন; তেমনি তাঁরা আতঙ্কিতও।

ওপরে আমরা চারজন। ঘরে ঢুকতেই ঘর ভর্তি। আমি, অরিন্দম ও ছেলেটি খাটে বসলাম। আর বসার জায়গা নেই। উচ্ছল লেখাপড়ায় কেমন, জানতে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কত পার্সেন্ট নম্বর পাও?

উচ্ছল বলল, 'এ-ই ৮০%-এর মতো পাই প্রতি সাবজেক্টে।'

কুমার আশুতোষ ইস্কুলের হেডমাস্টারকে ফোন লাগালাম। তিনি ডেকে পাঠালেন ক্লাসটিচারকে। ক্লাসটিচার বললেন, ৩৫-৪০%-এর বেশি নম্বর কোনদিনই পায় না উচ্ছল। স্পিকার চালু করেই কথা হচ্ছিল। উচ্ছল সেসব শুনেই চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা বলছে, একদম মিথ্যে কথা।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন মা ও বাবা। আমি বললাম, কি, ছেলে যা বলছে—সব সত্যি?

বাবা বললেন, 'ও সাঙ্ঘাতিক মিথ্যে কথা বলে এবং ধরাও পড়ে যায়।'

ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেও তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম না। আমি, অরিন্দম ও ইটিভির প্রতিনিধি—এই চারজনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ওর মা বাবাও বাইরে। উচ্ছল একাই ঘরে বসে আছে।

মিনিট দশেক পরে বললাম, চলুন, এবার ঢোকা যাক। ঘরে ঢুকে খাটে বসতেই দেখলাম, খাটের এক কোণায় চাদরের ওপর কিছু কালো রঙের গুঁড়ো পড়ে আছে। উচ্ছলের বাবাকে বললাম, একটা কাগজ নিয়ে আসুন তো? সেই কাগজটাকে ছিঁড়ে একটার সঙ্গে অপরটাকে জুড়ে ওই গুঁড়োটাকে তুললাম কাগজে। বললাম, এগুলো হলো পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

উচ্ছল যেদিকে বসেছে তার ডানদিকেই ওই গুঁড়ো থাকায়, ওর হাফপ্যান্টের

ডানপকেটে হাত দিয়ে নিমেষে বার করে আনলাম একটা ছোট্ট শিশি। বললাম, এই যে তরলটা দেখেছেন—এটাকে বলে গ্লিসারিন, দেখুন কেমন বিক্রিয়া হয়। কাগজে রাখা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ওপর দু-এক ফোঁটা গ্লিসারিন ফেলামাত্রই গরম হয়ে কাগজের ওপরে বুদবুদ উঠতে লাগল। শঙ্কুবাবুকে বললাম, একটু কাগজটাই ধরে দেখুন। ধরে বললেন, 'উঃ কী গরম হয়ে গেছে।'

তারপর বললাম, এখন উচ্ছল চাদরে আগুন লাগাতে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্লিসারিনটা বার করার আগেই আমরা ঘরে ঢুকে পড়ায় আগুন লাগানোর সুযোগ পায়নি। আরও বললাম, সমস্ত ভুতুরে কান্ডগুলোই উচ্ছল ঘটাচ্ছিল। পড়াশুনায় মন নেই, অথচ, স্মার্ট ফোন আছে। ফ্যাশান দুরস্ত জিনসের হাফপ্যান্ট—গরিব বাবার রাজপুত্তুর ছেলে। ইচ্ছে হচ্ছিল একটা থাপ্পড় মারি।

ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওঝা তান্ত্রিকের পেছনে কত টাকা খরচ করেছেন?

বাবা বললেন, ২০/৩০ হাজার তো গেছেই।

বললাম, দুদিকের দেওয়ালে দুটো সিসিটিভির ক্যামেরা লাগিয়ে দিন; দেখতেই পাবেন যে, আপনার ছেলেই এই ভুতুরে কান্ড ঘটাচ্ছে।

সত্যানুসন্ধান শেষে এবার আমরা বিদায় নিলাম।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী সংস্থাগুলো ১ মার্চ দিনটি 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি আমিই পারি ১ মার্চকে আক্ষরিক অর্থে 'আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস' করে তুলতে।

গড়ার নিয়ম জানা না থাকলে শুধু ভাঙার খেলা খেলে কখনওই কোনও আন্দোলন কোনও সমাজ অগ্রগতি ধরে রাখা সম্ভব নয়।

দেবু তান্ত্রিক ও হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ প্রবীর ঘোষ

সন্তোষ শর্মা

প্রবীর ঘোষ যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি তৈরি করেছেন 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' নামে একটি সংগঠন। জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার বাবাজি, মাতাজির বুজরুকি ফাঁস করার জন্য প্রবীর ঘোষ হাতে তুলে নিয়েছেন 'চ্যালেঞ্জ' নামক অস্ত্র। আজ পর্যন্ত কয়েকশো অলৌকিক দাবিদারের ভান্ডাফোড় করেছেন তিনি। কাউকে বা জেল খাটিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শেষ করার মত স্বার্থান্বেষী, হুজুকে, লোভি, ঈর্ষাকাতর শত্রুর অভাব নেই। প্রবীর ঘোষকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তৈরি করেছে তাঁর হাতে তৈরি 'যুক্তিবাদী সমিতি'র কিছু নেতা। হাজারো ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও প্রবীর ঘোষ আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন যুক্তিবাদী আন্দোলন।

প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রায় প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দেখেছিলাম, এক নেতা প্রবীর ঘোষকে খুন করার ষড়যন্ত্র করে। এখানে সেই ঘটনাটি তুলে দিচ্ছি।

শনিবার ২৮ জুন ২০০৩

স্থান বেলেঘাটা। একটি ছোট ঘরে। ঘরের মাঝে চৌকি পাতা। যুবক থেকে বৃদ্ধ বিভিন্ন বয়েসের অনেক মানুষ। তাদের মাঝে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ বসে। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' থেকে শুরু করে রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে উপস্থিত মানুষগুলোর মুখে। আর প্রবীর ঘোষ প্রত্যেকটির প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়ে চলেছেন। এটা প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে তৈরি করা 'যুক্তিবাদী সমিতি'র স্টাডি ক্লাস।

আজ এই স্টাডি ক্লাসে অরুপ সেন নামে এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি একটি খবর নিয়ে এসেছেন। খবরটি হল, ''বারাসাতে কালির সাধক 'দেবু তান্ত্রিক' তাঁর তৃতীয় নয়নের (?) সাহায্যে বলে দেন ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। কেউ কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে দেবু তান্ত্রিক তাঁর অলৌকিক (?) শক্তির দ্বারা সবকিছু বুঝতে পারেন এবং সমস্যার সমাধানের জন্য স্টোন বা মাদুলি দেন।''

বারাসাতে 'দেবু তান্ত্রিকে'র ভান্ডাফোড় করতে যাওয়ার আগে প্রবীর ঘোষ আমাদেরকে নিয়ে একটা 'হোমওয়ার্ক' করলেন। তিনি বললেন, ''কোনও জ্যোতিষী, তান্ত্রিক বা অলৌকিক দাবিদারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর আগে অথবা কোনও তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার সত্যানুসন্ধানে যাওয়ার আগ বিষয়টিকে নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

'হোমওয়ার্কে' প্রবীর ঘোষ ঠিক করলেন তিনি এবং আরও কয়েকজন ট্রেনে করে বারাসাত স্টেশন হয়ে 'দেবু তান্ত্রিকে'র ওখানে যাবেন। বাকিরা যে যার বাড়ি থেকে সোজা বারাসাতে চলে যাবে।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য আজ আমি দ্বিতীয়বার প্রবীর ঘোষের স্টাডি ক্লাসে এসেছি। আজও সেই ছেলেটাকে দেখলাম যে নিজের কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে রেখেছে। কথা বলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সোজা কথা? তোতলামি আছে তার। সেই আমাকে 'যুক্তিবাদী সমিতি'র নামে চাঁদা দেওয়ার জন্য সমিতির নামে একটা রসিদ আমাকে দিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছে কোনও বড় নেতা। প্রবীর ঘোষের খুব কাছের। নাম আশিস।

রবিবার ২৯ জুন ২০০৩

সকাল ১০টা নাগাদ আমরা যুক্তিবাদীরা প্রবীর ঘোষের কথামত একে-একে বারাসাত স্টেশন-এর কিছু দূরে একটি মোড়ের কাছে হাজির হলাম। একটু পড়েই 'ইটিভি প্রেস' লেখা গাড়িতে করে উপস্থিত হলেন প্রবীর ঘোষ। আমরা যে যার মত গেলাম 'দেবু তান্ত্রিকে'র বাড়িতে। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া কালি মন্দির। এই মন্দিরে 'দেবু তান্ত্রিক' তাঁর কাছে আসা মানুষের যে কোনও সমস্যার সমাধান করেন 'অলৌকিক' উপায়ে।

প্রবীর ঘোষ কোনও 'মেক আপ' ছাড়াই দেবু তান্ত্রিকের সামনে হাজির হলেন। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান এবং আর একজন মহিলা সাংবাদিক। দেবু তান্ত্রিক প্রবীর ঘোষকে তাঁর কালি মন্দিরে নিয়ে গেলেন। আমরাও ভক্ত সেজে মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ দেবু তান্ত্রিকের স্ত্রী প্রবীর ঘোষকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, ''আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। আপনি যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ না? আপনাকে মনে হয় কোথাও দেখেছি।''

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আমি প্রবীর ঘোষ নই।'' তবুও দেবুর স্ত্রীর মনে একটা খটকা থেকেই গেল।

মহিলা সাংবাদিক একটি সমস্যা দেবু তান্ত্রিককে বললেন। এই শুনে দেবু একটা সাদা কাগজে কয়েকটা পাতা ও ফুল ছিঁড়ে রাখলেন। ফুল-পাতা সমেত কাগজ নিয়ে কালিমূর্তির সামনে দেবু তান্ত্রিক প্রার্থনা শুরু করেন, ''হে মা, ওদের বিরাট

সমস্যা। ভালো মাদুলিটা দে। ছোট নয়, বড়টা, ভাঙাটা যেন দিস না আবার। ভুল করে ময়লা মাদুলিটা দিস না। চকচকেটা দে।"

মায়ের কাছে কাকুতি-মিনতির পর দেবু ঐ কাগজটি মহিলা সাংবাদিকের হাতে দিলেন। সাংবাদিককে কাগজটা মুঠো করে ধরতে বললেন। এরপর আবার কিছু মন্ত্র পড়ল তান্ত্রিক। শেষে দেবু বলল, ''মুঠো আলগা করে কাগজটা খুলে দেখুন।"

সাংবাদিক কাগজ খুলে দেখলেন, কাগজের মধ্যে ফুল-পাতার মধ্যে একটা মাদুলি বেরিয়ে এলো! সত্যি দেবু তান্ত্রিক অলৌকিক খেল দেখালেন!

দেবু তান্ত্রিকের কাছে যে কোনও সমস্যার অলৌকিক সমাধান আছে। প্রেম ভাঙতে হবে? জোড়া দিতে হবে সম্পর্ক? বিবাহে বাধা? কোন চিন্তা? সব সমাধান দেবুর কাছে আছে।

প্রবীর ঘোষের পরিকল্পনা অনুসারে একজন ছেলে এবং এক মেয়ে দেবু তান্ত্রিকের সামনে প্রেমের সমস্যা নিয়ে হাজির হলেন। তারা বিয়ে করতে চায়। কিন্তু দুই পরিবারের আপত্তি। সমাধান করুন দেবু?

এই শুনে দেবু তান্ত্রিক একটা ছোট খোল বাদ্যযন্ত্র আনলেন। তাতে দু-তাল দিয়ে বাজিয়ে মন্ত্রপড়া শুরু করলেন। এরপর একটা বড় চামচ দিয়ে খোলের গায়ে বিভিন্ন স্থানে আস্তে-আস্তে মারতে লাগলেন। শেষে বললেন, ''এই প্রেমি জুগলের প্রেম জোড়া লাগবে, বিয়ে হবে তাহলে খোল আমার চামচের অল্প আঘাতে ভেঙে যাবে।" জয় মা কালি বলে তান্ত্রিক খোলের গায়ে চামচ দিয়ে একটা আঘাত করলেন আর খোলটা মাঝখানে ফেটে গেলো! দেবু বললেন, ''প্রেম জোড়া লাগবেই বিয়ে হবে দুজনের।"

সবশেষে প্রবীর ঘোষ তাঁর একটি সমস্যার কথা দেবু তান্ত্রিককে বললে, ''একজন মেয়ের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করি। বিয়ে করতে চাই। নাম পারমিতা রুদ্র।" প্রবীর ঘোষের কথামত তান্ত্রিক মা কালির কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন। গলায় বাংলা মদ ঢাললেন। তারপর দেবু তান্ত্রিক নিজের কেরামতি শুরু করলেন।

প্রবীর ঘোষের হাতে ফুল দিয়ে মুঠো করে ধরে রাখতে বলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। এরপর তান্ত্রিক চিৎকার করে কালির মূর্তিকে বললেন, ''ওকে একটা সাদা স্টোন দে মা।" কিছুক্ষণ পর দেবু প্রবীর ঘোষকে মুঠো খুলতে বললেন।

প্রবীর ঘোষ নিজের মুঠো খুলে বললেন, ''আমার হাতে ফুলের মধ্যে দুটো স্টোন। একটা সাদা, একটা লাল।" দেবু তান্ত্রিক বলেছিলেন, ''আপনার হাতে একটা স্টোন আসবে। কিন্তু দুটো স্টোন কী করে এলো? এই দেখে 'চালাক' তান্ত্রিক বললেন, ''মা দুটো স্টোন ভুল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটা আপনার এবং একটা আমার জন্য।"

প্রবীর ঘোষের সামনে দেবু তান্ত্রিকের সব 'অলৌকিক' ক্ষমতা চালাকি ধরা

পড়ে গেল। কারণ, মাটির কালির মূর্তির কোনও কিছু পাঠানোর ক্ষমতা নেই। প্রবীর ঘোষের হাতে ফুল দেওয়ার সময় দেবুই একটা স্টোন ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এবং দ্বিতীয় স্টোনটি প্রবীর ঘোষ নিজেই হাত সাফাই করে নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

এত কিছু সত্ত্বেও দেবু তান্ত্রিক দমে যাওয়ার পাত্র নয়। প্রবীর ঘোষ নিজের আসল পরিচয় দিলেন। তখনও দেবু বলতে লাগলেন, ''আমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমি অলৌকিক ক্ষমতায় স্টোন-এর রং পাল্টে দিতে পারি।''

প্রবীর ঘোষ দেবু তান্ত্রিককে বললেন, ''ঠিক আছে। আমি হাতের মুঠোর মধ্যে সাদা স্টোন রাখছি। আপনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করে এই স্টোনের রং পাল্টে লাল করে দিন। যদি পারেন, প্রতিশ্রুতি রইল ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার সাথে সমিতি ভেঙে দেবো।''

না। দেবু তান্ত্রিক পাথরের রং পাল্টে দিতে পারলেন না। তবুও বলতে লাগলেন, ''তাহলে সাংবাদিকের হাতে মাদুলিটা কি করে এলো? খোল কীভাবে ভাঙল?''

এরপর প্রবীর ঘোষ 'ইটিভি' ক্যামেরার সামনে দেবু তান্ত্রিকের প্রত্যেকটি কারসাজি ফাঁস করে দেখালেন। দেবু তান্ত্রিকের ঢোল ফাটিয়ে দিলেন প্রবীর ঘোষ। প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জের সামনে দেবু তান্ত্রিক হেরে ভূত হয়ে মন্দিরে বসে পড়লেন। এর মধ্যে দেবুর স্ত্রী এসে চেঁচামেচি শুরু করলেন। ''আমি বলছিলাম না, এ প্রবীর ঘোষ। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না। দেখলে তো পুরো পাড়ার সামনে তোমার কি হাল হল?''

দেবুর স্ত্রী-কথায় যুক্তি আছে। কারণ প্রবীর ঘোষ কোনও 'মেকআপ' ছাড়াই দেবু তান্ত্রিকের সামনে হাজির হয়েছিলেন। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে দিলেন। কিন্তু দেবুর স্ত্রী প্রায় প্রবীর ঘোষকে চিনে ফেলেছিলেন। কারণ গত ১৫ জুন, ২০০৩-এ মহাজাতি সদনে জ্যোতিষ সম্মেলনকে প্রবীর ঘোষ লন্ডভন্ড করে দিয়েছিলেন। সেই খবরটি একটি নিউজ চ্যানেলে দেখিয়েছিল। বোধহয় ঐ খবরটি দেবুর স্ত্রী দেখেছিলেন। তাই দেবু তান্ত্রিকের সামনে প্রবীর ঘোষকে দেবুর স্ত্রী বললেন, ''আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। আপনি যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ না? আপনাকে মনে হয় কোথাও দেখেছি?''

প্রবীর ঘোষ মেকআপ ছাড়াই জ্যোতিষী, তান্ত্রিককে বিভ্রান্ত করে দেন। ওরা ভাবতে বাধ্য হয়—এ প্রবীর ঘোষ নয়। এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে নাকে খত দিয়ে ছাড়েন। যারা প্রবীর ঘোষের নাম ও ছবির সঙ্গে পরিচিত, তাদেরই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন যদি প্রবীর ঘোষ মেকআপ দেন তাহলে জ্যোতিষ, তান্ত্রিকের কী অবস্থা হতে পারে। সত্যি এটা প্রবীর ঘোষের পক্ষেই সম্ভব।

বিনা মেকআপ-এ শুধুমাত্র বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথাবার্তা পাল্টে ফেলে পরিচিত প্রবীর ঘোষকে মনে হয় এক অন্য প্রবীর ঘোষ।

দেবু তান্ত্রিকের 'অলৌকিক' ঢোল ফাটিয়ে দিয়েছেন প্রবীর ঘোষ। এই দেখে আমাদের কি আনন্দ। আমরা সবাই 'যুক্তিবাদী সমিতি'র ব্যানার নিয়ে দেবুর বাড়ির সামনে মাঠে 'যুক্তিবাদ জিন্দাবাদ'-এর জয়ধ্বনি তুললাম। এরপর একটা মিষ্টির দোকানে প্রবীর ঘোষ আমাদের সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন।

এতো গেল দেবু তান্ত্রিকের ভান্ডাফোড়ের ঘটনা। কিন্তু আসল ভয়ংকর ঘটনার সূত্রপাত তো গতকাল বেলেঘাটা স্টাডি ক্লাসেই শুরু হয়ে গেছিল।

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আজ আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তাই আমি বারাসাতে ট্রেনে করে না এসে 'ইটিভি'র গাড়িতে করে এলাম।''

আমি প্রবীর ঘোষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''আপনি কিভাবে খবর পেলেন, আপনাকে খুন করার ষড়যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে?''

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আমি প্রত্যেকটি দলেই নিজের বন্ধু খুঁজে নিই। পুলিস-প্রশাসন, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতাদের। এদের মধ্যে আমি নিজের বন্ধু খুঁজে নিই। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। ফলে বহুক্ষেত্রে আমি আগাম খবর পেয়ে যাই।''

তিনি আরো বললেন, ''এক জ্যোতিষী আমাকে খবর দিয়েছিলেন। আপনার আলমারির উপর মুভি ক্যামেরা থাকে?'' বললাম, ''হ্যাঁ''।

ফোনের ওপ্রান্ত থেকে বললেন, ''আপনার যুক্তিবাদী সমিতির এক নেতার নাম। সেই নেতা জ্যোতিষীকে জানিয়েছে, ''আমি কাল সকালে বারাসাতে দেবু তান্ত্রিকের ভান্ডাফোড় করতে যাব। আপনার দলে একজন গানম্যান আছে। নাম মুজিবর।''

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আমি এই খবরটি পেলাম দেবু তান্ত্রিকের ওখানে যাওয়ার একদিন আগে সন্ধাতে। এই খবরটি আমি কাউকে জানালাম না। পরের দিন অর্থাৎ ২৯ জুন-এর সকালে আমার ট্রেনে করে বারাসাত স্টেশন হয়ে দেবু তান্ত্রিকের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। সকালে আমি দুইজন সহযোদ্ধাকে ডেকে পাঠালাম। তাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নেতাটিও আছে। আমি আমার গাড়িতে বাগুইহাটি গেলাম। বাগুইহাটিতে 'ইটিভি' নিউজ-এর গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি এই গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমাদের নেতাটি হতচকিত।''

প্রবীর ঘোষ আরো আমাকে বললে, ''আমার একজন সহযোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ট্রেনে। সে আমাকে খবর দিল, ''হ্যাঁ, মুজিবর ওখানে অপেক্ষায় আছে। সে স্টেশন পার হয়ে প্রথম মোড়ে অপেক্ষায় আছে।''

''এই খবর পাওয়ার পরেও আমি দেবু তান্ত্রিকের কাছে পৌঁছালাম। বিনা

মেকআপে। দেবুর তান্ত্রিকের অলৌকিক দাবির ভান্ডাফোড় করলাম। দেবুর অলৌকিক গল্পের ঢোল ফাটিয়ে দিলাম।"

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''দেবু তান্ত্রিকের ভান্ডাফোড় করেছিলাম, এটি একটি ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা হল পরের দিন অর্থাৎ ৩০ জুন-এ। ভোরবেলায় সেই তোতলা নেতা ফ্লাটবাড়ি থেকে ওর সমস্ত জিনিস ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। এমনকি প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও ফেলে পালিয়ে গেল। আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রকারি তোতলা নেতার নাম আশিস।"

আমি প্রশ্ন করলাম, ''আশিস কেন আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তৈরি করেছিল?"

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''যিনি আমাকে খবরটা দিয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন, ''মারতে পারলে পাঁচ লাখ এ্যাডভান্স আড়াই লাখ। কিন্তু গানম্যান ওকেই ফিট করতে হবে।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ''আশিসের ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন ছিল?"

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আশিস পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের ছেলে। আর আট-দশ মধ্যবিত্ত ছেলেদের মত নাম কেনার প্রবণতা ছিল। কিন্তু সাধ্য ছিল না। তার অর্থলোভ ছিল। প্রেমিকার কাছ থেকেও টাকা হাতাতে কসুর করেনি।"

একের পর এক বাবাজি-মাতাজি, জ্যোতিষি, তান্ত্রিকের ভান্ডাফোড় করার পর সেই সব ভন্ডরা প্রবীর ঘোষের উপর কেমন হারে চটা হবে তা কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র লোভের কারণে যদি সমিতির কোনও সদস্য প্রবীর ঘোষকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র তৈরি করতে পারে, তাহলে পাঠকরা কি বলবেন?

বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার দিকে একটু সচেতনতার সঙ্গে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন ওই পত্রিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চায়, সমাজের সেরা লেখক, সেরা শিল্পী, সেরা বুদ্ধিজীবীরা তাদের পত্রিকায় লেখেন, আঁকেন। ফলে ওই পত্রিকায় স্থান পাওয়া, জনগণের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের ISI ছাপ পাওয়া হয়ে দাঁড়ায়। এর পর ওরা ইচ্ছে মতন একজনকে প্রচারের তুঙ্গে তুলে নিয়ে যায়, একজনকে ব্ল্যাক আউট করে জনগণ থেকে নির্বাসিত করে। জনপ্রিয় সব পত্রিকাই কম-বেশি একই মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।

মনসার ভর

শংকর ভড়

২০০৬ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিক। উচ্চশিক্ষায় শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ (৪৯.৫%) আসন সংরক্ষিত করবার সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব সব রাজনৈতিক দলের ইচ্ছায় পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবিত এই সংশোধনী রুখতে আন্দোলনরত ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং-বিজনেস ম্যানেজমেন্টের একঝাঁক ঝকঝকে মেধাবী তরুণ-তরুণী একদিন আমাদের নাগেরবাজারের ক্লাসে প্রবীরদার সঙ্গে দেখা করতে এল। ওরা 'ইউথ ফর ইক্যুয়ালিটি'।

ওরা জানাল দেশের মেধা-শক্তির এই বিপুল অপচয় রুখতে ওরা সারা দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে প্রস্তাবিত এই সর্বনাশা সংশোধনী বিল বাতিল করতে চাইছে। কিন্তু ওদের সমর্থনে শাসক বা বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলকেই ওরা পাশে পাচ্ছে না। কারণ বাম-ডান-গেরুয়া সকলের সর্বমত সম্মতি নিয়েই এই প্রস্তাবিত সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। স্বীকৃত কোন রাজনৈতিক দল ওদের পাশে না থাকায়, ওদের আন্দোলন দানা বাঁধতে পারছে না। শেষ ভরসা হিসেবে ওরা র‍্যাশানালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষের কাছে সহযোগিতা চাইতে এসেছে। প্রবীরদা ওদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের আমার কাছে পাঠালেন কে?'

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ। তারপর নিজেদের মধ্যে একটু ফিস্‌ফাস্‌-মুখচাওয়াচাওয়ি -ইশারায় কথা বলার পর ওদের মধ্যে একজন (সম্ভবতঃ নিখিল) বলল, 'নেপালের মাওবাদী নেতা 'প্রচণ্ড' এদেশে পড়তে আসা নেপালি ছাত্রদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আপনার নাম রেফার করেছেন। বলেছেন, যেহেতু সব রাজনৈতিক দলই এই আন্দোলনে তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে কিছু করতে হলে বা জিততে হলে তোমরা প্রবীর ঘোষের সাহায্য নাও। একমাত্র উনিই পারবেন এইরকম পরিস্থিতিতে তোমাদের আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে।' একটু পরেই নেপাল থেকে ফোন এল। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবার অনুরোধ জানিয়ে। প্রবীরদা সম্মতি জানালেন। সেদিনই শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি।

শুরু হল আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির পরিকল্পনা। প্রবীরদার নির্দেশমত 'ইউথ ফর ইক্যুয়ালিটি'র ব্যানারে জনমত তৈরি করতে কয়েক'শ মেধাবী তরুণ-তরুণী দিনরাত এককরে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—আই.আই.টি.-সহ

শহর, শহরতলীতে, হাটে-বাজারে, গ্রামেগঞ্জে এই জাত-ভিত্তিক সংরক্ষণে শিক্ষার মান অবনমনের সুদূর প্রসারী কুফল ও ক্ষতিসাধনের কথা উচ্চশিক্ষিত-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা জনগণকে বুঝিয়ে বলতে লাগল। প্রথাগত লিফলেট, ব্যাপার, পোস্টার তো ছিলই। পাশাপাশি প্রবীরদা ওয়েবসাইট ও মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে প্রচারকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে বললেন। মোবাইলে মেসেজের ঝড় উঠল। উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়ে এক তুমুল আলোড়ন অথচ নিঃশব্দ ঝড় বইতে শুরু করে দিল। প্রবীরদার নেতৃত্বে 'ইউথ ফর ইক্যুয়ালিটি'র এই আন্দোলনকে সফল করাই যুক্তিবাদী সমিতির তখন একমাত্র লক্ষ্য—'পাখির চোখ'।

ঠিক এই রকম ব্যস্ত এক সময়ে ২২ জুলাই ২০০৬, শনিবার আমাদের হাবড়া শাখার তৎকালীন সম্পাদক সুদীপ চক্রবর্তী সঙ্গী শৌভিক সরকারকে নিয়ে আমাদের ক্রিক রো-র ক্লাসে হাজির। ক্লাস তখন প্রায় শেষ। অনেকেই বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে। সুদীপ জানালো, উঃ ২৪ পরগণার বারাসাতে স্টেশনের কাছেই একটি বাড়িতে এক ছেলের শরীরে মনসার ভর হয়েছে। ছেলেটির বয়স ২২/২৪। নিয়ম করে বৃহস্পতিবার আর রবিবার ছেলেটির ওপর 'মা মনসা' ভর করছেন। মানুষের নানা অসুখ-বিসুখ, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনায় অমনোযোগীতা, স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি-পরকীয়া, যুবতী মেয়েদের বিয়ের সমস্যা, বেকার যুবকদের চাকরির সমস্যা, বিবাহিতা মেয়েদের সন্তানহীনতা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে শয়েশয়ে মানুষ এই পুরুষরূপী 'মা মনসার' শরণাপন্ন হচ্ছে।

'মা' ভরের সময় তাদের নানা প্রতিকার-প্রতিবিধানের উপায় বাতলে দিচ্ছেন। লোকে নাকি দারুণ ফলও পাচ্ছে। প্রচুর প্রণালী পড়ছে। সুদীপ, শৌভিক আর মানসকে নিয়ে গত ১৬ জুলাই রবিবার স্পট ভিজিট করে মা মনসার মন্দিরসহ স্বয়ং মা মনসাকে দর্শন করে এসেছে। উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য যতটুকু সম্ভব যোগাড় করেছে। ক্যামেরায় মা মনসার একখানা ছবিও তুলে এনেছে। খাম থেকে বের করে ও ছবিটা প্রবীরদাকে দেখতে দিল। প্রবীরদা দেখবার পর আমাদের সবাইকে দেখতে দিলেন। দেখলাম, বেনারসী পরা কনে বউ-এর সাজে একেবারে মর্ডান মনসা। প্লাক করা ভুরু, গালে রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক, গলায় সীতাহার, হাতে বাউটি, বালা, মাথায় মুকুট, ম্যাচিং ব্লাউজ পরে সুন্দরী মা মনসা সুদীপের ক্যামেরায় পোজ দিয়েছেন।

সুদীপ খবর নিয়ে জেনেছে মা মনসার আসল নাম মিলন সাহা। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার চাঁদপাড়ায়। বারাসাত স্টেশনের কাছে এখনকার এই মন্দির বাড়িটা মিলনের দিদির বাড়ি। এই বাড়িতে থাকতে থাকতেই প্রায় দু-বছর আগে একদিন মিলনের মনসা দর্শন হয়। তারপর থেকে প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার দুপুর বারোটা বাজলেই মা মনসা বারাসাতের এই স্টেশন বাড়িতে নেমে আসেন। মিলনের শরীরে

ভর করে অগণিত ভক্তকে দর্শন দেন। সেই সময় মিলন মুখে যা বলে, তাই ফলে। যে দাওয়াই বলে দেয়, তাতেই রোগ নির্মূল হয়।

সুদীপ আরও খবর নিয়ে জেনেছে মিলনের জামাইবাবুর একাধিক ভাই। জামাইবাবু ছোট। আগে বাড়িটায় টালির চাল, ছিঁটেবেড়ার দেওয়াল আর মাটির মেঝে ছিল। মা মনসার কৃপায় মিলনের ভর হওয়ার এক বছরের মধ্যেই পুরো বাড়ির মেঝেটাই সিমেন্ট হয়েছে। দেওয়াল পাকা হয়ে ডিস্টেম্পার রঙের ছটায় উজ্জ্বল হয়েছে। টালির ছাদের বদলে পুরো একতলা বাড়িটাই এখন ঢালাই ছাদের নীচে। ছাদের ওপর পিলার উঠে গেছে। পুজোর পরেই দোতলা তৈরি শুরু হবে। তারপর পুরো পরিবারটাই দো-তলায় উঠে যাবে। একতলার পুরোটাই তখন মন্দিরের কাজে ব্যবহার হবে।

সুদীপ আর শৌভিক প্রবীরদাকে ধরল, 'দাদা কাল রবিবারই (২৩.৬.২০০৬) এই ছেলে মনসার ভান্ডাফোড়টা করে দিন।'

সুমিত্রাদি বললেন, 'কাল দুপুর তিনটায় কয়েক হাজার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-ম্যানেজমেন্টের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলেজ স্কোয়ার থেকে 'ইউথ ফর ইক্যুয়ালিটির ব্যানারে মিছিল বেরোবে। নেতৃত্ব দেবেন প্রবীরদা। সুতরাং কাল একেবারেই অসম্ভব, তোমরা বরং অন্যদিন ঠিক করো।

সুদীপ যাত্রার পেশাদার অভিনেতা। ও জানাল আগামী সপ্তাহে অভিনয় করতে ও দলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে চলে যাবে। ফিরতে দিন কুড়ির ধাক্কা। তারপর আবার দুর্গাপুজোর শিডিউল শুরু হবে। সুতরাং পরবর্তী সময় মনসা বধের জন্য ও আর সময় বের করতে পারবে না। প্রবীরদা চুপচাপ সকলের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, চল, কাল সকালেই মনসা-বধ সেরে আসি। বারোটায় মনসার ভর শুরু হলে বড়জোর এক ঘন্টার মধ্যে মানে একটায় মনসা বধ শেষ। থানা-পুলিশের ফর্মাল কাজ শেষ করতে আরও আধঘন্টা। তারপর গাড়ি নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে আমরা তিনটের আগেই পৌঁছে যাব। সুমিত্রা তোমাকে বারাসাতে যেতে হবে না। তুমি সকাল থেকে মিছিলের দায়িত্বে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঘন্টায় ঘন্টায় যোগাযোগ রেখে ঠিকঠাক জমায়েতের ব্যবস্থাটা শুধু করো।'

প্রবীরদার সঙ্গে তখন একগাদা কেবল চ্যানেলের ওঠাবসা। খোঁজখবর, স্টার-আনন্দ, ইটিভি নিউজ, আকাশ বাংলা, কলকাতা টিভি, এটিএন বাংলা, তারা নিউজ, আজতক, এনডি টিভি কে নেই। সকলেই প্রবীরদার সঙ্গে ভান্ডাফোড়ের খবর করতে চায়। প্রবীরদাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকেই এক্সক্লুসিভ কভার করার সুযোগ দেন।

প্রবীরদা প্রথমে স্টার-আনন্দকে ফোন করলেন। কোনো কারণে চিফ-এডিটরের মোবাইল তখন সুইচ-অফ্। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিউজের চিফ-এডিটরকে ফোনে

ধরলেন। ভান্ডাফোড়ের কথা বলতেই এডিটর যেন হাতে চাঁদ পেলেন। ঠিক হল তারা নিউজের ফুল-টিম দুজন ফটোগ্রাফার নিয়ে সকাল-সকাল প্রবীরদার বাড়িতে হাজির হবেন। ওখান থেকে প্রবীরদা ও মানসীকে তুলে নিয়ে ওরা বারাসতে রওনা হবে। মানসী সমিতির ক্যামেরা নিয়ে প্রবীরদার সঙ্গে থাকবে, ছবি তুলবে। এরপর ভান্ডাফোড়ের ট্রিক তৈরি করার পালা।

প্রথম জুটি ঃ শৌভিক ও চৈতালী। ওরা সাজবে বিপদগ্রস্ত প্রেমিক, প্রেমিকা। শৌভিক একটা ছোট বে-সরকারি সংস্থায় খুব অল্প-মাইনের চাকুরে। এমন একটি ছেলেকে চৈতালীর ধনী পরিবার জামাই করতে নারাজ। মেয়ের প্রেমের কথা জানতে পেরে চৈতালীর জাঁদরেল বাবা এখন মেয়ের জন্য অন্যত্র সুপাত্র সন্ধানে ব্যস্ত। ওরা দুজনে রেজেস্ট্রী বিয়েটা সেরে নিয়েছে। ঠিক আছে বাবার চাপ আর একটু বেশি হলেই চৈতালী একবস্ত্রে পাকাপাকিভাবে শৌভিকের বাড়িতে এসে উঠবে। চৈতালী নিজেও একটা চাকরির চেষ্টায় নানা জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াচ্ছে। যাতে বিয়ের পর সংসার খরচের ধাক্কাটা দুজনের যৌথ রোজগারে মোটামুটিভাবে সামাল দেওয়া যায়। ইতিমধ্যে শৌভিকের কোম্পানি মাস চারেক হল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ কোম্পানি এখনই খোলবার কোন সম্ভবনা নেই। ফলে শৌভিক এখন পুরোপুরি বেকার। এই খবরটা কোনভাবে চৈতালীর বাবার কানে এসে পৌঁচেছে। ফলে ভদ্রলোক আর সময় নষ্ট না করে দ্বিগুণ উৎসাহে মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র-সন্ধানে নেমে পড়েছেন। বিয়ের জন্য চৈতালীর ওপর ক্রমশঃ চাপ বাড়ছে। লোকমুখে মা মনসার মাহাত্ম্যের কথা শুনে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ওরা আজ মা মনসার স্মরণ নিয়েছে।

দ্বিতীয় জুটি ঃ সন্তোষ ও অনিন্দিতা। অবাঙালি ছেলে সন্তোষ বাঙালি মেয়ে অনিন্দিতাকে বাড়ির অমতে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তিনবছর হয়ে গেছে, অনিন্দিতার কোন সন্তান হচ্ছে না। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম দেখিয়েছে, কোন লাভ হয়নি। হিন্দুস্থানী শাশুড়ির মুখ ঝামটা শুনতে শুনতে অনিন্দিতা কাঁদে। ওরা এসেছে একটি সন্তান কামনায়। যদি মা মনসার আশীর্বাদে অনিন্দিতার বাঁজা নাম ঘোচে। অবিবাহিতা অনিন্দিতাকে প্রবীরদা নির্দেশ দিলেন, কাল যেন ও অবশ্যই হাতে শাঁখা-রুলি পরে আসে। কপালে মোটা করে মেটে সিঁদুর সিঁথিতে থাকে।

তৃতীয় জুটি ঃ অবিবাহিত সুদীপ কারোর একজন বউকে ধার করে যোগাড় করবে ও বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সেজে মনসা মন্দিরে ঢুকবে। পারিবারিক ব্যবসায় অনেক টাকা লোকসান হওয়ায় সুদীপদের পরিবারে এখন নিত্য অশান্তি। সুদীপের হাতেই যেহেতু পারিবারিক ব্যবসার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া ছিল, সেহেতু ব্যবসা-বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পরিবার তাকে সুদীপের নতুন বউকেই অপয়া বলে দায়ি করা হচ্ছে।

বাজারে প্রচুর টাকা দেনা হয়ে গেছে। পাওনাদাররা সকাল-বিকাল তাগাদায় আসছে। সুদীপ ওর নতুন বউকে নিয়ে এসেছে এই আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মা মনসা যদি ওকে উদ্ধার করেন।

চতুর্থ জুটি ঃ সংগ্রামদা ও ছবিদি। যেহেতু ওদের দুজনের কেউই এখন এখানে উপস্থিত নেই সেহেতু আগামীকাল ওরা কোন চরিত্রে অভিনয় করবে সেটা আজ রাত্রে প্রবীরদা ওদের ফোনে বলে দেবেন। ওদের অভিজ্ঞতা প্রচুর—অসুবিধে হবে না। আলোচনা শেষ।

উঠব, উঠব করছি। সুদীপ কয়েক ঘন্টার নোটিশে যদি কোন বউকে যোগাড় করতে না পারে এই দুঃশ্চিন্তায় অবশেষে আমাকেই ধরল মানে আগামীকাল আমার বউকে ধার নিতে চাইল। বাধ্য হয়ে বাড়িতে ফোন করলাম। ল্যান্ডলাইন বেজে গেল। কেউ ধরল না। বুঝলাম আমার বউ এখন বাড়িতে নেই। এখন পূর্ণিমার সঙ্গে কথা না বলে সুদীপকে কথা দিলে তার বেঁকে বসার সম্ভবনা প্রবল। সুদীপকে বললাম, 'আমার বউ-এর ভরসায় বসে না থেকে তুমি বরং অন্য কাউকে যোগাড় করার চেষ্টা কর। আমি বাড়ি গিয়ে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে রাজি করাতে পারি, তাহলে তোমাকে ফোন করব।'

বাড়িতে এসে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে ক্রীম মাখিয়ে পূর্ণিমাকে কথাটা বলতেই ও পত্রপাঠ না বলে দিল। তখন বললাম, 'প্রবীরদা বিশেষ করে বলেছেন, যে কাল কয়েক ঘন্টার জন্য সুদীপের বউ-এর অভিনয় করে এই ভান্ডাফোড়টা তোমায় উতরে দিতে হবে। তাছাড়া আমি তো তোমার পাশে পাশেই থাকবো।' প্রবীরদা অনুরোধ করেছেন শুনে আর নিজেকে টি.ভি.তে দেখতে পাওয়ার লোভে বউ আর জেদ ধরে রাখতে পারলো না। নরম হলো। তারপর বললো—'ছেলেকে কোথায় রেখে যাব? কে সামলাবে? অন্য কারো কাছে ছেলেকে রেখে আমি অতক্ষণ বাইরে থাকতে পারবো না।'

বললাম—'গৌরবকে সঙ্গে নিয়েই যাব। আমার কাছে থাকবে। তুমিশ পাশ থেকে নজর রাখতে পারবে।' অবশেষে বউ রাজি হল। সুদীপকে ফোনে বলে দিলাম। সুদীপ নিশ্চিন্ত হল। এবার ছেলেকে মানে সাত বছরের গৌরবকে একটু শিখিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। ছোটবেলা থেকেই ও প্রবীরদার ভক্ত। কাল ট্রেনে করে ও অনেক দূরে যাবে আর সেখানে প্রবীরদার অ্যাকশন নিজের চোখে দেখতে পাবে শুনে ওতো আনন্দে লাফাতে লাগল। ভাল করে ওকে বুঝিয়ে বললাম—'কাল ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তোমার মাকে কিন্তু তোমায় একদম ভুলে যেতে হবে। মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসবে না, চোখের ইশারা করবে না, কোন কথা বলবে না। যা প্রয়োজন হবে শুধু আমাকেই বলবে।' ও বিষয়টা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিল।

পরদিন খুব সকালে উঠে সামান্য একটু ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে

পৌঁছলাম। ওখান থেকে ট্রেনে বারাসাত। স্টেশনের বাইরে আসতেই চায়ের স্টলগুলোতে আলাদা আলাদা গ্রুপে সমিতির ছেলে-মেয়েদের দেখতে পেলাম। সুদীপ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। আমার বউকে দেখে এগিয়ে এসে ডেকে নিল। তারপর একটা ফাঁকা দোকানের বেঞ্চে বসে চায়ের অর্ডার দিল। আমি গৌরবকে নিয়ে পাশের দোকানের বেঞ্চে বসলাম। মিনিট দশেক পরে সন্তোষ-অনিন্দিতাকে দেখতে পেলাম। দেখলাম অনিন্দিতার হাতে শাঁখা-রুলি কিছুই নেই। কপালে সিঁদুর নেই—শাড়ি একটা পরেছে বটে কিন্তু মাথায় ঘোমটা নেই। একটু পরেই ফোনে প্রবীরদার নির্দেশ এল, 'সন্তোষ-অনিন্দিতা যেন আজকের ভান্ডাফোড়ে অংশ না নেয়। মনসাকে যেন কোন প্রশ্ন না করে। বড়জোর ভক্ত সেজে মন্দিরের ভেতরে যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

একটু পরেই ফোন এল। শুনলাম শৌভিক আর চৈতালী খুব সকালেই এসে গিয়েছিল। বসে না থেকে ওরা সাত-সকালেই পুজো দেওয়ার নাম করে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে জায়গাটা খুব ভাল করে রেইকি করে নিয়েছে। মন্দির বাড়ির মহিলারা যেচে ওদের সঙ্গে আলাপ করে কোত্থেকে আসছে, কেন এসেছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে ওদের আসার উদ্দেশ্যটা জেনে নিয়েছে। ওরাও সবিস্তারে ঐ মহিলাদের ওদের সমস্যার কথা শুনিয়ে দিয়ে এখন স্টেশনে এসে বসেছে একটু চা-সিঙাড়া খেতে। ভর শুরু হওয়ার আগেই আবার ওরা মন্দিরে ফিরে যাবে। একটু পরেই মন্দিরে যাওয়ার নির্দেশ এল। একসাথে না গিয়ে কিছুটা করে দূরত্ব রেখে দুজন দুজন করে আলাদা আলাদা গ্রুপে আমরা মা মনসার স্পটে মানে মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। সুদীপের বাক্সের বাইরে উঁকি মারছে জবার মালা।

মন্দিরের বাইরে থেকেই প্রবীরদার বাঁজখাই গলা শোনা যাচ্ছে। 'আগে বাইরে বেরোন', বলে কাউকে ভীষণ ধমকাচ্ছেন। মন্দিরের ভেতর ঢুকতে গিয়ে দেখি উল্টোস্রোতে ভক্তদের দল হুড়মুড় করে ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

একজন ভক্তকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে মন্দিরের ভেতরে এখন টি.ভি. কোম্পানির লোকজন ঢুকেছে। আলো লাগাচ্ছে, ক্যামেরা বসাচ্ছে। আর ওদের যেটা হেড—ঐ টুপি পরা লোকটা, তার কী বদ-মেজাজ—আর কী গলার জোর।

সব্বাইকে গরু তাড়া করে বাইরে বের করে দিয়েছে। বলল, আগে আমার ক্যামেরা বসবে, আলো বসবে, তারপর তোমরা বসবে। তারপর যখন বলবো একজন একজন করে ভেতরে ঢুকবে।'

উঠোনে তখন শ' দুয়েকের বেশি ভক্তের ভিড়। একবার ভেতরে ঢোকার সঙ্কেত পেলেই সকলে হুড়মুড়িয়ে ঢোকবার জন্য তৈরি। আমার কোলে সাত বছরের ছেলে। ঠ্যালাঠেলিতে দুপায়ে দাঁড়িয়ে ব্যালেন্স রাখাই দায়। একটু পরেই ভেতর থেকে প্রবীরদা বেরিয়ে এলেন। আধমিনিট ভিড়টায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে

নিজের লোকদের খুঁজে নিলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি এক এক করে যাকে যাকে ডাকবো শুধুমাত্র তারাই ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকবেন।' 'আপনি আসুন', বলে একজন বৃদ্ধাকে প্রথমে ডাকলেন। বৃদ্ধা যেন লটারির টিকিট পেলেন। গুটিগুটি পায়ে তরতর করে ভেতরে গেলেন। এরপর আরেকজন বৃদ্ধা চান্স পেয়ে 'জয়মা', 'জয়মা' বলে ভেতরে চলে গেল।

আমি অনেক দূরে ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে আছি দেখে প্রবীরদার দয়া হল। বললেন, 'বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা ছেড়ে দিন ওকে।'

আমি ছেলেকে নিয়ে মা মনসার মাটির মূর্তির সামনে একদম প্রথম সারিতে জায়গা নিয়ে নিলাম। আবার আমার পাশে একজন বৃদ্ধ এল। তারপরেই চৈতালী-শৌভিক।

একটু পরেই সুদীপ আর আমার বউ পূর্ণিমা এসে বসলো, দ্বিতীয় লাইনে ঠিক আমার পেছনে। তারপর আবার দু-চারজন ভক্ত। তারপরেই সংগ্রামদা-ছবিদি, একটু পরেই সন্তোষ-অনিন্দিতা। মানসী ক্যামেরা নিয়ে তো আগেই প্রবীরদার সঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে। এখন লাইটম্যানাদের ডিরেক্শান দিচ্ছে। নিজের টিমের সব্বাইকে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বসিয়ে দেওয়ার পর প্রবীরদা অপেক্ষমান ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'একদম হুড়োহুড়ি না করে আপনারা ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করুন। আমি এখন ভেতরে চলে যাচ্ছি। প্রবীরদা পেছন ফিরতেই শুরু হল ধস্তাধস্তি। কে আগে মন্দিরে ঢুকবে তার জন্য শুরু হল জোর ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি। হুড়মুড়িয়ে ভক্তরা তখন মন্দিরে ঢুকতে শুরু করলো। পদপিষ্ট না হলেও দু-একজন আছাড় খেল। কিভাবে ভেতরের সব লোককে বাইরে বের করে এনে ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজের লোকদের তুলে এনে একেবারে সামনে বসিয়ে দিতে হয়—এই বিদ্যেটা আজ প্রবীরদার কাছ থেকে নতুন ভাবে শিখলাম। তুমুল চিৎকার আর হল্লাবাজি করে সব ভক্তদের বাইরে বের করে দেওয়ার রহস্যটা তখন জলের মত সহজ হয়ে গেল।

বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আর অসীম সাহসের মেলবন্ধনে প্রবীরদা লিডারশিপকে যে-কোন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে পারেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রবীরদার সঙ্গে এ্যাকশনে গেলে সব সময় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়। কখনও হাড় হিম করা অভিজ্ঞতা, আবার কখনো শুধুই মজা। প্রবীরদার সঙ্গে থেকে যারা দীর্ঘদিন কাজ করেছে, শুধু তারাই জানে এমন গুরু-সঙ্গের কি মহিমা।

একেবারে সামনে বসে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রায় ফুট ছয়েকের মা মনসার মাটির মূর্তি দর্শন করছি। ফুল-মালা-বেলপাতায় সজ্জিতা। সামনে তামার কোষাকুষি, সোনার বড় আম্রপল্লব, পিতলের ঘন্টা, শাঁখ, পিতলের ফুট চারেকের পঞ্চপ্রদীপ, পিলসুজ। এমন সময় হঠাৎ জোর শোরগোল, কয়েকজন মহিলার চিৎকার। 'মা এসে গেছে', 'মা এসে গেছে', পা তুলে বোস।' ঠাসাঠাসি ভীড়ের মধ্যে সবাই কোনরকমে

পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে জায়গা করে দিচ্ছে। সেই সংকীর্ণ জায়গা ধরে বারমুন্ডা পরা ২২/২৪ বছরের একটি ছেলে 'নাগিনা' সিনেমার শ্রীদেবীর স্টাইলে মাটিতে বুক ঘস্‌টে ঘস্‌টে সাপের মতো অঙ্গভঙ্গি করতে করতে গর্ভমন্দিরে এসে ঢুকলো। তারপর কালো পাথরের জামবাটিতে মুখ গুঁজে চক্‌চক্ শব্দে প্রায় মিনিট দুয়েক ধরে দুধ খেতে লাগল। (পরে শুনেছিলাম প্রবীরদার তাড়ায় সেদিন আর মা মনসার বেনারসী পড়া হয়নি, বারমুন্ডা পরেই ভর হয়েছিল।) ভক্তদের 'জয়মা', 'জয়মা' শব্দে তখন কান পাতা দায়। দুধ খেয়ে মিনিট তিনেক মা মনসা তখন নিথর হয়ে মেঝেতে শুয়ে বিশ্রাম নিল। তারপর হঠাৎ নাকি সুরে প্রশ্ন করা শুরু করল।

—'কে এসেছিস্ চাকরির সমস্যা নিয়ে?'

সামনে থেকে শৌভিক বলে উঠল—'আমি মা, আমি।' মা বললেন,—'এত তাড়াতাড়ি তোর কোন চাকরি বাকরি জুটবে না।' এবার চৈতালীর গলায় একরাশ উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল। চৈতালী বলল, 'তাহলে কি হবে মা? অন্তত ৬ মাসের মধ্যে মোটামুটি একটা চাকরি ও না পেলে যে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

মনসা বলল—'ছয় মাস কি রে, এক বছরেও ওর কোন ভাল চাকরি জুটবে না।'

চৈতালী বলল—'ও কি তাহলে এখন বেকারই থাকবে?'

মা বলল—'হ্যাঁ, বেকারই থাকবে।'

চৈতালী বলল—'মা তুমি আমাদের দয়া করো মা। তোমার করুণায় সব অসম্ভব তো সম্ভব হয়। তোমার দুয়ারে যে বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম মা গো, তুমি আমাদের ওপর একটু সদয় হও মা। ওর একটা চাকরি এখন না জুটলে আমাদের দুজনের জীবনটাই যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে মা।'

চৈতালীর আকুতিতে এবার মা মনসার মন গললো।

মনসা বলল—'পরের সপ্তায় লালচেলী আর পদ্ম নিয়ে আসিস। ধৈর্য চাই, দেরি হবে। যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেব।'

এবার মা ডাকলো, 'কে এসেছিস ব্যবসাপত্তর গণ্ডগোল নিয়ে?'

অন্য কেউ সাড়া দেওয়ার আগেই সুদীপ জোর চিৎকার করে উঠলো, 'আমি মা, আমি' বলে।

সুদীপ—'আমায় দয়া করো মা, বিপদ থেকে উদ্ধার কর। 'মনসাবলল, 'খুব খারাপ অবস্থা চলছে। রোজগারপাতি তো বন্ধ। বউ-এর সঙ্গে নিত্য অশান্তি লেগেই রয়েছে। তোর সংসার তো আর চলছে না। পদ্ম আর চেলী নিয়ে আসিস। তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবো।'

স্রেফ অনিন্দিতার পাকামিতে আজ আমাদের টিমের একটা জুটি ক্যানসেল হয়ে গেছে। মনে মনে ঠিক করলাম, আজ অনিন্দিতা আর সন্তোষের গ্যাপটা আমিই বরং কিছুটা মেক-আপ করে দেব। আমার কোলে বসে তখন সাত বছরের গৌরব।

অতএব চিৎকার করে কাঁদ-কাঁদ গলায় মা মনসাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলাম, 'মাগো, এই বাচ্চা ছেলেটাকে একটু দয়া করো মা। একে ফেলে এর মা চলে গেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—পারিনি মা। এর মাকে ফিরিয়ে আনার একটা ব্যবস্থা করে দাও মা। কিছু একটা উপায় করে দাও মা।'

সবাই চুপ। বুঝি পিন পড়লেও শব্দ হবে। মা মনসাও তখন মেঝেতে মুখ গুঁজে একেবারে ঠান্ডা। বোধহয় ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে। মনসা যাতে ভাল করে বোঝে তাই গলায় কান্নার সুর দ্বিগুণ করে একই কথা রিপিট করলাম।

প্রবীরদা ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমার হয়ে ওকালতি শুরু করে দিয়েছেন। প্রবীরদা মনসাকে বললেন, 'মা আপনি এই বাচ্চার মায়ের বিষয়ে কিছু বলুন। এরা বলছে, অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছে।' মা মনসা ততক্ষণে আমার সমস্যাটা বুঝে নিয়েছে, মানে টোপটা গিলে নিয়েছে। একটু সময় নিচ্ছে এই নতুন কেসের ডায়ালগ তৈরি করতে।

একটু পরেই মা মনসা মুখ খুলল, 'দয়াহীন, মায়াহীন, নিষ্ঠুর। দুধের বাচ্চাকে ফেলে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।'

আমিও মনসাকে একশো শতাংশ নিশ্চিত করতে আরও করুণ স্বরে 'হ্যাঁ মা, হ্যাঁ' বলে ককিয়ে উঠলুম। তারপর বললুম, 'মা আপনিতো সবই জানেন মা। এই বাচ্চাটার মুখ চেয়ে এর মাকে ফিরিয়ে আনার একটা উপায় করে দিন মা।'

মনসা বলল, 'খারাপ মেয়েছেলে। দুধের বাচ্চা ফেলে পালিয়েছে। ও এখন ফিরবে না।' বললাম, 'আপনি সব পারেন মা। আপনার অসাধ্যি তো কিছু নেই মা। এই বাচ্চাটার জন্য ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন মা।'

মনসা বললো—'পরের সপ্তাহে পদ্ম আর লালচেলী আনবি, তারপর দেখবো। পরপর তিন-তিনটে কেসে মায়ের অলৌকিক ক্ষমতা ডাহা ফেল। প্রবীরদা আর দেরি করতে রাজি নন। মা তখন ডাকছে, 'কে এসেছিস হার্টের অসুখ নিয়ে?' প্রবীরদার নির্দেশে ক্যামেরাগুলো এবার মন্দির থেকে বাইরের উঠোনে আনা হল। যাদের সমস্যা শুনে মা মনসা ভরে এতক্ষণ যা যা বলে দিলেন, এবার ক্যামেরার সামনে তাদের এসে দাঁড়াতে হবে। 'তারা নিউজ' সরাসরি তাদের ইন্টারভিউ নেবে।

প্রথমেই ডাক পড়লো শৌভিক আর চৈতালীর। প্রবীরদা ওদের পুরো নাম আর ঠিকানা বলতে বললেন। দুজনের নাম ঠিকানা রেকর্ডিং হওয়ার পর প্রবীরদা ইন্টারভিউ শুরু করলে। ক্যামেরার চারপাশে ভিড় বাড়ছে। মনসার দিদি-জামাইবাবু আর বাড়ির লোকেরা ক্যামেরার সামনে হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে অনেক ভক্তও এসে ক্যামেরার পাশে দাঁড়াচ্ছে। ওদিকে ভেতরে মনসার ভর চলছে। শোনা যাচ্ছে, 'কে এসেছিস মামলার ঝামেলা নিয়ে?'

উঠোনে ভিড়টা বেশ জমাট বেঁধেছে। সবাই ইন্টারভিউ দেখতে উদগ্রীব।

প্রবীরদা শুরু করলেন চৈতালীকে দিয়ে।

প্রবীরদা—'এতদূর থেকে এসে মা মনসার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তোমার কেমন লাগছে?'

চৈতালী—'বিশ্বাস করুন খুব খারাপ লাগছে। দেখলাম এই মা মনসার কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই।'

প্রবীরদা—'নেই বলছো কেন?'

চৈতালী—'সবই তো ভুল-ভাল বলল। মা মনসাকে পরখ করতে এসে বুঝলাম, এখানে দৈবী-শক্তির নামে বুজরুকি চলছে। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এখানে রোজ প্রতারণা হচ্ছে। প্রথমতঃ আমরা দুজন আদৌ প্রেমিক-প্রেমিকা নই। দুজনের কারোরই বিয়ের জন্য কোন তাড়াহুড়ো নেই। মনসা মা বললো শৌভিক এখন বেকারই থাকবে, অথচ শৌভিক তো বেকার নয়।

প্রবীরদা শৌভিককে—সেকি? সত্যিই তুমি বেকার নও?

শৌভিক—না, আমি একটা স্থায়ী চাকরি করি।

প্রবীরদা—সরকারি না বেসরকারি?

শৌভিক—সরকারি।

প্রবীরদা—সরকারের কোন অফিসে ও কি পদে এখন কর্মরত আছ, বল।

শৌভিক—আমি দমদম সেন্ট্রাল জেলের জেলার।

প্রবীরদা—কি বললে? জেলার! কি সর্বনাশ, জেলারকে বলেছে বেকার! মনসা তো দেখছি তাহলে জেলেই যাবে।

ইন্টারভিউ শুনে আমরা হাসছি। এদিকে মনসার দিদি-জামাইবাবু আর বাড়ির লোকজনের মুখ শুকিয়ে চুন। ফ্যাল ফ্যাল করে ওরা তখন জেলার সাহেব শৌভিককে দেখছে।

প্রবীরদা মজা করে শৌভিককে বলছেন, 'রাজি থাকোতো তোমার জেলেই মনসাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।'

হঠাৎ আবার সেই পিলে চমকানো বাঁজখাই গলা। ঐ গলার আওয়াজে মরা মানুষও বোধহয় একবার চোখ খুলে তাকাবে। 'এই বাচ্চার বাপটা কোথায় গেল?' দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, 'ঐখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে ছেলেকে নিয়ে আমার ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াও।' আমি গৌরবকে নিয়ে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

প্রবীরদা—'তোমার পুরো নাম, ছেলের নাম আর বাড়ির পুরো ঠিকানা বল।'

বললাম।

প্রবীরদা—'তোমার বউ তো পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে? কার সঙ্গে পালিয়েছে?'

বললাম—'বউতো কোথাও পালায়নি। ভরের সময় মন্দিরে আমার পাশেই গা সাঁটিয়ে বসেছিল। মা মনসাকে প্যাঁচে ফেলতেই বউ পালানোর গল্প ছেড়েছি।

মনসাও আমাকে বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দিয়েছে, আর পরপুরুষের সঙ্গে আমার বউ পালানোর কথা সবার সামনে বলে বসেছে। এই মনসার কথায় বিশ্বাস করে রোজ অসংখ্য মানুষ ঠকে। আজ আমার কথায় বিশ্বাস করে মনসা নিজেও ঠকলো।'

প্রবীরদা গৌরবকে—'এই বাচ্চা তোমার মা কোথায়?' গৌরব একটু দূরে ওর মাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। তারপরেই দৌড়ে গিয়ে ওর মাকে হাত ধরে টেনে এনে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

প্রবীরদা গৌরবকে—'এ সত্যিই তোমার মা?' গৌরব পূর্ণিমার গলা জড়িয়ে ধরল।

প্রবীরদা আমায়—'এই মহিলা তোমার বউ? ঠিক বলছ তো?' দুজনের ভোটার আই-কার্ড সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, পকেট থেকে বের করে প্রবীরদার হাতে দিয়ে বললাম, 'ছবি মিলিয়ে দেখে নিন।'

প্রবীরদা ছবি দুটো কয়েকশ লোকের সামনে তুলে ধরে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনারা দেখুন আপনাদের মনসা মা যাকে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছে বলেছে এই সেই মা। দিব্যি মন্দিরের ভেতর ছেলের আর ছেলের বাপের পাশে বসে এতক্ষণ মনসার ভর হওয়া দেখছিল।

এখন তো আপনারা বুঝতে পারছেন, আপনাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মনসা এখানে কেমন লোকঠকানোর কারবার ফেঁদে বসেছে। আপনাদের প্রণামীর টাকায় রোজ কয়েক হাজার করে টাকা রোজগার করে নিচ্ছে। অনুরোধ করছি, আপনারা এই বুজরুকদের প্রশ্রয় দেবেন না। অন্ধবিশ্বাস ছেড়ে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বিজ্ঞানমনস্ক হন। বিজ্ঞান সচেতন হন। আপনাদের সচেতনতাই একটা সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।' ততক্ষণে ভেতরে খবর চলে গেছে। সব তালগোল হয়ে গেছে বুঝে মনসার ভরও তখন ঘুচে গেছে। মনসা ঠাকুরঘর ছেড়ে ভেতরের কোনও ঘরে লুকিয়ে পড়েছে। ঠাকুরঘর ফাঁকা—কেউ নেই। বাকি ভক্তরাও হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে আসছে। এই সময়টা খুব মারাত্মক। মন্দিরওয়ালাদের পক্ষ থেকে মরিয়া হয়ে এই সময়টায় একটা গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হয়। অনেক বাবাজী-মাতাজীদেরই পোষা মস্তান, মাসলম্যান থাকে। কিছু বেচাল হলে তখন ঐ পোষা গুন্ডারাই সামাল দেয়। এই সময় মাস্তানরা ক্যামেরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে রিল খুলে নেয়। নিয়ম মেনে তৃতীয় ক্যামেরার রিল খুলে মানসী আগেই গাড়িতে রেখে এসেছে। প্রবীরদা বাকি দুই ফটোগ্রাফারকে নিয়ে মন্দির থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। ক্যামেরা রাস্তায় নামতেই পথচলিত পাবলিক, আশপাশের বাড়ির লোকেরা ক্যামেরার সামনে জড়ো হতে শুরু করল। ভক্তদের ভিড় তো ছিলই। সব ভিড় মিলেমিশে এখন একেবারে জমে কুলপি।

ঠাসা ভিড়ের মধ্যে সুদীপের ইন্টারভিউ শুরু হল। সুদীপ জানালো—'সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা বা স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তির প্রশ্নই ওঠে না কারণ আমি তো এখনও বিয়েই করিনি। ওর পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল, 'আমি একজন পেশাদার অভিনেতা।

রোজগার যা করি তাতে ভালোভাবেই চলে যায়। প্রতি বছর আয়কর দিই। আমার সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে যে মহিলা ছিলেন তিনি আমার স্ত্রী নন। যে বাচ্চাটির মা পালিয়ে গেছে বলে মনসা দাবি করল, ঐ মহিলাই ঐ বাচ্চাটির মা। কোথাও পালায়নি। আমার স্ত্রী হিসাবে প্রক্সি দিয়ে ছেলের পাশেই বসেছিল।

সফল অপারেশনের খবর জানিয়ে দিলেন। আমাদের ছেলেরা গাড়ি থেকে যুক্তিবাদী সমিতির ব্যানার নিয়ে এসে মন্দিরের সামনে থেকে একটা মিছিল তৈরি করে অঞ্চল পরিক্রমা শুরু করে দিল। শ্লোগান উঠল 'মনসার ভান্ডাফোড় করল কারা—যুক্তিবাদী সমিতি আবার কারা।' 'বুজরুকদের কালো আস্তানা ভেঙে দিন, গুঁড়িয়ে দিন।' অগণিত জনতা আওয়াজ তুললো—'ভেঙে দিন, গুঁড়িয়ে দিন।' দশ মিনিটের ছোট মিছিলে তখন হাজার খানেক লোক সামিল হয়ে গেছে। মন্দিরের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে প্রবীরদা এইবার মিছিল নিয়ে মন্দির বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন। মনসার ঘরের দরজায় ততক্ষণে খিল পড়ে গেছে। বাইরে ঝুলছে বড় তালা।

প্রবীরদা মনসার দিদি-জামাইবাবুকে বললেন, 'এক্ষুণি মনসাকে আমার সামনে হাজির করুন। দেরি করলে পাবলিক কিন্তু দরজা ভেঙে মনসাকে টেনে বাইরে আনবে। আর একবার পাবলিক ক্ষেপে গেলে তখন আর আমি মনসার কোন দায়িত্ব নিতে পারবো না।'

দিদি-জামাইবাবু প্রবীরদার পা জড়িয়ে ধরে তখন কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। বলতে লাগল, 'স্যার, এইবারটা মাফ করে দিন। কথা দিচ্ছি, কাল থেকেই এসব এক্কেবারে বন্ধ করে দেবো।' অবশেষে বিধ্বস্ত মনসা প্রবীরদার নির্দেশে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রবীরদা বললেন—'তুমি যদি সত্যিই মা মনসা হও, তবে আজ এতগুলো ভুল বললে কেন?'

মনসা—'রোজই তো সব ঠিকঠাক বলি, আজই কেমন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।'

প্রবীরদা—'এখনও নাটক। থাবড়া মেরে তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। বাইরের পাবলিককে দেখছ তো। একবার ইশারা করলে এখনই তোমার চামড়া গুটিয়ে নেবে।'

বাইরের জনসমুদ্র আর জনতার মেজাজ দেখে মনসা এবার একেবারে ভেঙে পড়ল। হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। প্রবীরদা আবার ধমকালেন। বললেন, 'এইসব কান্নাকাটি একেবারে বন্ধ করো। এই বিদ্যে নিয়ে তুমি হার্টের অসুখ, লিভারের অসুখ, কিডনির অসুখ সারাতে নেমেছো? তুমি এখানে সবার সামনে স্বীকার করো যে তোমার ওপর কোন দেব-দেবীর ভর হয় না। পুরোটাই তুমি অভিনয় কর।'

মনসা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

প্রবীরদা—'তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে এতদিন ধরে তুমি ভক্তদের সঙ্গে প্রতারণা

করেছ? তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রণামীর টাকায় বড়লোক হয়েছ?'

মনসা 'হ্যাঁ' বলে স্বীকার করল।

প্রবীরদা—'মাসে কত টাকা প্রণামী থেকে রোজগার হয়?'

মনসা—'দশ হাজার টাকা মতো।'

প্রবীরদা—'আবার মিথ্যে। তোমাকে আজই জেলে ঢোকাবো।'

মনসা—'চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার হয়,' বলে মনসা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রবীরদা—'একটু আগেই তাহলে দশ হাজার বললে কেন?'

মনসা—চুপ। ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রবীরদা এবার প্রচণ্ড জোর মনসাকে ধমক দিলেন। বললেন, 'খালি মিথ্যে কথা বলতে শিখেছো। এক্ষুণি গুনে গুনে দশবার কান ধরে ওঠ-বোস্ শুরু করো।' অগণিত ভক্ত আর জনতার সামনে মনসা সুড়সুড় করে বাধ্য ছেলের মত কান ধরে ওঠ-বোস শুরু করে দিল। ক্যামেরায় মনসার ওঠ-বোসের ছবি উঠছে। ছোটরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে, পাড়ার মেয়েরা হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, আমরাও তারিয়ে তারিয়ে মনসা-বধ উপভোগ করছি। শুধু মনসার বাড়ির লোকেরা আর কিছু ভক্ত ফ্যাল ফ্যাল করে প্রবীরদার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অবশেষে অনেক কষ্টে মনসা দশবার ওঠ-বোস্ শেষ করল।

প্রবীরদা বললেন, 'আমি থানায় কমপ্লেন দিতে যাচ্ছি। আর সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এখানে যদি আবার এসব বদমাইশি শুরু হয় তো এই বাড়ির সব্বাইকে জেলে ঢুকিয়ে ঘানি টানানোর পাকাপাকি ব্যবস্থা করে তবে ছাড়ব।' এইবার মনসার দিদি-জামাইবাবু আর অন্যান্য আত্মীয়েরা চারদিক থেকে প্রবীরদার পায়ে আছড়ে পড়ল। জামাইবাবু বলল, 'কথা দিচ্ছি আর এমন কারবার এখানে চালু করবো না। আজই মিলনকে এখান থেকে সরিয়ে দেব। দয়া করে পুলিশে খবর দেবেন না।'

প্রবীরদা বললেন, 'দুঃখিত। আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারবো না। আমাদের সমিতির নিয়ম মেনে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দাখিল আমাকে করতেই হবে। তারপর পুলিশ-প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আপনারা পুলিশ-প্রশাসনকে অনুরোধ করে দেখতে পারেন।'

সময় শেষ। বারাসাত থানায় লিখিত কমপ্লেন দাখিল করে দুপুর আড়াইটের মধ্যে যখন আমরা কলেজ স্কোয়ারে এসে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সুমিত্রাদি হাজার পাঁচেক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে 'ইউথ ফর ইকুয়ালিটি'র মিছিল শুরু করবার তোড়জোড় করছেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটির সামনে তখন তিল-ধারণের স্থান নেই। পুলিশ 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। চারদিকে শুধু কালো মাথা। পোস্টার-ব্যানারে ঢেকে গেছে দৃশ্যপট। সে আর এক ইতিহাস। অন্য কোনদিন বলব।

বিশ্বাস বনাম আত্মবিশ্বাস

অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

এই দুইটি একপ্রকারের মানসিক স্থিতি, যার প্রভাব মানুষকে কিছু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, সেই কারণে এই দুটিকে আলাদা করে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনবোধে এই নিবন্ধের অবতারণা।

বিশ্বাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অত্যন্ত আবশ্যিক মনের দশা। যাকে বর্জন করে জীবনে অগ্রসর হওয়াই যায় না, আবার এই বিশ্বাসই আমাদের যুক্তিবিচারকে আচ্ছন্ন করে, এক অন্ধগলিতে নিয়ে যাবার হাতছানি দেয়। তাই শেষবিচারে বলব বিশ্বাস আমাদের মজবুরী (compulsion) এবং সেইসঙ্গে কমজোরি (constraint)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই যে আমরা দূরদূরান্তে রেলে অথবা বিমানে যাত্রা করি তখন এ বিশ্বাস নিয়ে আমাদের গাড়িতে বা বিমানে চড়তেই হয় যে এই চালক আমাকে নির্বিঘ্নে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে। চালকের পারদর্শীতা আমার না জানা থাকলেও। যেহেতু আমাকে বিশ্বাস নিয়ে চলতেই হবে, এটিকে তাই বলব আমার মজবুরী। আবার যদি জীবনযুদ্ধে অন্যের উপর বিশ্বাস করে (এমনকি ভগবানের উপরেও) নিরন্তর এগিয়ে চলি তাহলে আমার জীবনযুদ্ধের হাতিয়ারগুলি, প্রয়োগের অভাবে নষ্ট হতে বাধ্য। জীবনযুদ্ধের হাতিয়ারগুলি হল আমার হাত, পা আর বিচারবুদ্ধি। এবং জীবনযুদ্ধের চেহারাটি কেমন? এ সংসারে সবকিছুই ত অনিশ্চিত এক মৃত্যু আর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ছাড়া। সেই কারণে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। যেমন শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক এবং আর্থিক প্রতিকূলতা যেটিকে আমরা আমাদের উপরোক্ত হাতিয়ারগুলির সাহায্যে অনুকূল করে নিচ্ছি। এটিকে আরেক ভাবে বলা যায় struggle for our existence (বাঁচার লড়াই)।

সাধারণত আমাদের মনের জগৎটি দুভাগে বিভক্ত। একটি এর কাল্পনিক সত্যের জগৎ। অপরটি প্রমাণিত সত্যের জগৎ। কাল্পনিক সত্যের জগতে যারা অবস্থান করেন তাদের একমাত্র অবলম্বন ভবিতব্য ওই ভগবান। আর যাদের প্রমাণিত সত্যের জগতে অবস্থান, তারা প্রয়োগ এবং প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেন। এখন এই কাল্পনিক সত্যের জগৎটি কেমন? যেমন কিছু ব্যক্তি আজও বলেন বা বিশ্বাস করেন বর্বর হনুমান বা অশ্বত্থমা এঁরা নাকি আজও জীবিত এরা অমর। অন্যদিকে প্রমাণিত

সত্যের জগতের লোকেরা যেমন মানেন। যে জন্মাল তার মৃত্যু নিশ্চিত। আবার যে মৃত সে আবার কখনই চিতাভস্ম থেকে বা কবর থেকে উঠে আসবে না (resurrection) মানুষের রক্তের রং লাল তা কখনও হলদে বা সবুজ হবে না। এখন যে যত বেশি কাল্পনিক সত্যের মধ্যে অবস্থান করেন (বেশি কথাটা এইজন্যে বলা যে কাল্পনিক সত্য জগতের মানুষ হলেও পরিস্থিতি বা পরিবেশের তাড়নায় তাদের মাঝে মাঝে বাধ্য করে প্রমাণ ও প্রয়োগের শরণার্থী হতে) ততই তাদের আত্মবিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে যায়। দূর্বল আত্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনযুদ্ধে মহড়া নেওয়া আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্বাসের উৎস কোথায়? দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে উঠে আসে আত্মবিশ্বাস। আবার দৃঢ় সংকল্প তখনি নেওয়া যায় যখন আমাদের মনে ইচ্ছাশক্তির প্রাচুর্য থাকে। ঐ ইচ্ছাশক্তিটি কোন ঠিকানায় পাওয়া যায়। সেটি প্রথমেই আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। ইচ্ছাশক্তির বসবাস প্রেরণা ও পরিবেশের মধ্যে। যেমন কেউ যদি খেলায় পারদর্শী হতে চায় তাকে খেলার মাঠে যেতেই হবে (পরিবেশ) যে খেলা শেখাবে তার সংস্পর্শে আসতেই হবে (প্রেরণা) সেইমত যে গায়ক হতে চায় তাকে গানের রেওয়াজ যেখানে চলছে সেখানে যেতে হবে আর যিনি গান শেখাবেন তাঁর সংস্পর্শে আসতে হবে প্রেরিত হবার জন্যে। শেষবিচারে, ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্তি এবং বৃদ্ধির জন্যে পরিবেশ ও প্রেরণা এই দুটি নিতান্তই অপরিহার্য।

এরই সন্দর্ভে একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমরা ১০/১৫ জন মিলে প্রভাতে একটি গাছপালায় ঘেরা মাঠে ব্যায়াম করতে যাই। সেখানে একটি যুবক অতি উৎসাহ নিয়ে ২/৩ মাস আমাদের সঙ্গে ব্যায়াম করতে আসত। হঠাৎ দেখা গেল সে আর আসছে না। খবর নিয়ে জানলাম সে অন্যত্র ইদানিং কোথাও ঘুরতে যায়। অকস্মাৎ একদিন ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হওয়াতে জানতে চাইলাম আমাদের ওখানে না আসার কারণটি কি? জবাবে বলল—ওকে কি আমাদের ওখানেই গিয়ে ব্যায়াম করতে হবে, অন্য কোথাও কি যেতে পারে না। ওর প্রশ্নের উত্তরে ওকে আরেকটি প্রশ্ন করলাম—তুমি কি মন্দিরে যাও?

—হ্যাঁ, আমি মন্দিরে যাই।

আবার ওকে প্রশ্ন করলাম মন্দিরে কেন যাও? ঈশ্বর ত সর্বত্রই বিরাজমান। ঈশ্বর দর্শনে মন্দিরে কেন যেতে হবে?

ছেলেটির উত্তর না পেয়ে বললাম, তোমার জবাবটি আমিই দিচ্ছি—তুমি এইজন্যে মন্দিরে যাও কারণ ওখানে একটি ধার্মিক পরিবেশ আছে এবং সৎসঙ্গ পাবার অবকাশও আছে। ঠিক সেইভাবেই, আমাদের ঐ ব্যায়াম স্থানটিকে আমরা সকলে মিলে একটা ব্যায়ামচর্চার পরিবেশ তৈরি করেছি এবং নিঃস্বার্থ ভাবনা নিয়ে। তোমাকে ভবিষ্যতে প্রেরণা দেবার মত হয়ত তুমি আর কাউকে পাবে না।

বলাবাহুল্য যুবকটিকে এরপর আর কোথাও দেখা যায় না। আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আরও একটু বলবার আছে। সাধারণত আমরা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে বশীভূত হয়ে থাকি আর এই বশ্যতা আমাদের আত্মবিশ্বাসের বুনিয়াদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ যেমন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর আমাদের বিবেক বা সাধারণ জ্ঞান আমাদের মনে করায় কিছু স্বাস্থ্যচর্চা বা ব্যায়াম করতে এখন অনিচ্ছা আমাদের এমন ভাবে বাধা দেয় বা demotivate করে যার জন্যে বিবেক বা সাধারণ জ্ঞান কোনটাই এখন আর আমাদের সক্রিয় করতে পারে না এবং সেই অনিচ্ছার কাছে হার মানার গ্লানিটুকু আড়াল দিতে নানান অজুহাতের চাদর দিয়ে ঢেকে আমরা সন্তুষ্টি পাবার চেষ্টা করি। ঠিক এইভাবেই যারা মদিরা পানে আসক্ত বা ধুমপান, তামাকে আসক্ত তাদের ইচ্ছাটি নেশার কারণে এতই তীব্র যে সবরকম ক্ষতি মানে শারীরিক, পারিবারিক, জানা সত্ত্বেও ঐ তীব্র ইচ্ছার কাছে নতজানু হয়ে নিজের আত্মগ্লানিকে নানান অজুহাতের চাদরে ঢেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়ায়। এদের তখন ভবিতব্য বা ভগবান ছাড়া আর কোন গতি থাকে না। আত্মবিশ্বাস এখন জীবনের তলানিতে গিয়ে ঠেকে। সম্প্রতি এক কাল্পনিক সত্য জগতের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে দেখা হল। সাধারণ হালহকিকত জানার জন্যে ওনাকে প্রশ্ন করাতে উনি জানালেন এই শরীরস্বাস্থ্যই বলুন আর দশাদুর্দশাই বলুন এমনকি মৃত্যুও আমাদের ৮০% ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। এর থেকে কারও কোন রেহাই বা মুক্তি এ সংসারে নেই। মানুষ শুধু ২০% প্রয়াস করে কিছুটা সামলাতে পারে। ইচ্ছে করছিল বলি, যদি এই মানসিকতা নিয়ে ১০/২০ বছর আরও যদি আপনি এ সংসারে টিকে থাকেন তখন দেখবেন আজকের এই percentageটি 90% ভাগ্য এবং 10% প্রয়াস বা আরও কম সংখ্যায় পাল্টে যাবে। কিছুই বললাম না কারণ ওরা কাল্পনিক সত্য জগতের মানুষ যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না।

এবার ঠিক যে বক্তব্য নিয়ে আরম্ভ করেছি সেইখানেই ফিরে আসি।

বিশ্বাস আমাদের পরনির্ভরতা বাড়ায়। প্রশ্ন করার সাহস কেড়ে নেয়। প্রয়োগের কোন ইচ্ছাই মনে জাগে না। বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তুর নেশায় বুঁদ হয়ে নিজের অস্তিত্বের, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের চরম অবমাননা আমরা করি। অপরদিকে আত্মবিশ্বাস, জ্ঞানের আলোকে আমাদের চিন্তাচেতনাকে আপ্লুত করে। ক্রমান্বয়ে মনে প্রশ্ন জাগায় আর সে উত্তরের অন্বেষণে নব নব ভাবনা জাগে মনে।

মহাকালের এই বিশাল অঙ্গনে মানবপ্রজাতির এই দীর্ঘ প্রাণের মিছিলে, আমাদের আত্মবিশ্বাস ভরা ক্ষণিকের এই উপস্থিতি কোথাও না কোথাও সামান্য একটু চিহ্ন রেখে যাবে, হয়তোবা মিলিয়ে যাবে যুগান্তরের ঝরা পাতায়।

যুক্তিবাদী পড়ুন ও পড়ান

আপনার খাদ্য ও ওষুধপত্র নিরাপদ করে তুলুন

ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক নোটিফিকেশন নং জিএস্আর ৬৬৪ (ই) অনুসারে আগাম মোড়ককৃত পণ্যের বাধ্যতামূলক লেবেল সাঁটার শর্ত প্রবর্তন করেছে। এই শর্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য বেছে নেওয়ায় ক্রেতাদের সাহায্য করবে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল,

- নিম্নোক্তের পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য পরিমাণগত মাত্রায় লেবেলে ঘোষণা করতে হবে :
  - i) এনার্জি
  - ii) প্রোটিন
  - iii) কার্বোহাইড্রেট
  - iv) ফ্যাট

- অভ্যন্তরীণ ওজন/আয়তনের পর পর উপাদানগত তালিকা ঘোষণা করতে হবে।
- স্বাস্থ্যের দাবি করে এমন পুষ্টিকারিতার পরিমাণ ঘোষণা করতে হবে।
- কোনো খাদ্যের প্রস্তুতিকরণে যদি হাইড্রোজেনকৃত ভেজিটেবল ফ্যাট ব্যবহার করা হয় তাহলে এতে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, এটি ঘোষণা করতে হবে।
- উৎপাদিত দ্রব্য ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড মুক্ত—যদি এ রকম দাবি করা হয়, তাহলে প্রতি সার্ভিসিং পিছু টাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ০.২ গ্রামের অধিক হওয়া চলবে না।
- এই শর্তগুলি ১৯.৩.২০০৯ থেকে বলবৎ হবে।

ক্রেতাসাধারণের স্বাস্থ্য ও রোগীর নিরাপত্তার স্বার্থে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, ১৯৪০-এর আইনগত শর্তগুলি আরো কঠোর করা হয়েছে :

- নিম্নমানের কৃত্রিম, ভেজাল ও নকল ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ অথবা বিক্রি করার জন্য শাস্তি তীব্র করা।
- রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় শাস্তি আজীবন কারাবাস পর্যন্ত হবে।
- মৃত্যু অথবা আশংকাজনক ক্ষতির জন্য দশ লক্ষ পর্যন্ত অথবা বাজেয়াপ্ত পণ্যের মূল্যের তিন গুণের মধ্যে যেটি বেশি, সেই পরিমাণ অর্থ জরিমানা হবে।
- অপরাধীর নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ ভেজাল ও কৃত্রিম ওষুধের প্রভাবে আশংকাজনক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে।
- কৃত্রিম ও ভেজাল ওষুধ খেয়ে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয়কে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দেশে কৃত্রিম ওষুধের পরিধি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি দেশব্যাপী সমীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সত্যমেব জয়তে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক

ভুতুড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধান কিভাবে করবেন

সন্তোষ শর্মা

ভূত বলে কিছুই নেই। তবুও ভূতকে কেন্দ্র করে ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে। সবার আগে এই কথা যুক্তি দিয়ে বুঝে নিন—ভূত বলে বাস্তবে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। অতএব ভূতকে কেন্দ্র করে যদি কোথাও, কোনও ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে তাহলে তাঁর পিছনে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিযুক্ত কারণ অবশ্যই খোঁজা সম্ভব।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর ঘোষ। তিনি কয়েকশো ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য ভেদ করে সত্য তুলে এনেছেন। কেউ যদি ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তাকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নেয়।

যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের এই চ্যালেঞ্জ-এর হাতিয়ার করে যে কেউ ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য ভেদ করতে পারেন। ভৌতিক ঘটনার সত্যানুসন্ধান আপনিও করতে পারবেন। কিভাবে ভূতে ভর, ভুতুড়ে ঘটনার, সমস্যার সমাধান করবেন তার প্রশ্ন উত্তরে এখানে পেশ করছি। আমি যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষকে প্রশ্ন করেছি। উনি যুক্তিযুক্ত উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ কোথাও যদি কোনও ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে তাহলে তার সত্যানুসন্ধান কিভাবে করবো?

প্রবীর ঘোষ ঃ যদি অলৌকিক বা ভূতে বিশ্বাস থাকে তাহলে কোনওদিনও ভুতুড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধান করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ঃ কোনও ভুতুড়ে ঘটনায় অনেক প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা কি বিশ্বাসযোগ্য নয়?

প্রবীর ঘোষ ঃ কোনও ভুতুড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধানে নামলে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী পাবেন। ভুতুড়ে কান্ডকারখানা যত শুনতে চাইবেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা ততই শোনাবেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আট থেকে আশি সব বয়সের নারী পুরুষ পাবেন। বিখ্যাত মানুষও পাবেন। মনে রাখবেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রত্যেকেই মিথ্যে কথা বলছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় এরা মিথ্যে কথা বলেন। নতুবা নিজেদের বিশ্বাসকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মিথ্যে কথা বলছে। আজ পর্যন্ত পাওয়া কয়েকশো ভুতুড়ে ঘটনার প্রত্যেকটির সমাধান করে আমি একথা বলছি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে ভুতুড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধানে এই প্রত্যক্ষদর্শীর কথার কোনও দাম নেই?

প্রবীর ঘোষ ঃ কোনও ভুতুড়ে ঘটনার সত্যানুসন্ধানে সবার আগে মূল কি ঘটনা, তা জানার চেষ্টা করুন। একটি খাতায় ঘটনার বিস্তৃত রিপোর্ট-এর মত নোট রাখুন। এরপর ঘটনার প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শীর মিথ্যে কথা মন দিয়ে শুনতে থাকুন। খাতায় কথার মূল বক্তব্য লিখে রাখুন। এরপর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা অন্যজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন দুজনের বক্তব্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কিনা। মনে রাখবেন, প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান আলাদা-আলাদা ভাবে একান্তে নেবেন। সেখানে দ্বিতীয় কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর কথা প্রশ্ন আকারে অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে তুলে ধরে জেরা করতে থাকুন। সত্য বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন ঃ কারও উপর যদি ভূতে ভর হয়, তাহলে সমাধানের উপায় কি?

প্রবীর ঘোষ ঃ যখন ভূত বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, তখন কারও ওপর ভূতে-ভর-এর প্রশ্নই ওঠে না। যদি কোন মহিলা বা পুরুষের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে মনে হয় তাকে বুঝি ভূতে পেয়েছে। আসলে ঐ মানুষ প্রত্যেকেই রোগি। ভূতে ভর হওয়া প্রত্যেকে মহিলা বা পুরুষ মানসিক রোগি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভূতে পাওয়া বা ভূতে ভর বলে পরিচিত রোগটি মানসিক। হিস্টিরিয়া, স্কিটসোফ্রিনিয়া এবং ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ—এই তিনটি মানসিক রোগকে ভূতে বিশ্বাসিরা ভূতে ভর বা ভূতে পাওয়া বলেন। ভূতে পাওয়া অর্থাৎ মানসিক রোগের আধুনিক মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানে চিকিৎসা সম্ভব।

সাধারণভাবে হিস্টিরিয়া অথবা অবদমিত আবেগ থেকে কারও-কারও ভূত-এ ভর হতে পারে। কোনও মনোরোগ চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসা ও পরামর্শ অনুসারে ওষুধ খেলে হিস্টিরিয়া রোগ সেরে যাবে।

একটি উদাহরণ—একটি ধনী ঘরের মেয়ে একটি গরিব ঘরের ছেলের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই সেই মেয়েটি যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ থেকে যে গরিব ঘরে বউ হয়ে এসেছে সেই পরিবেশকে কিছুতেই মানিয়ে উঠতে পারছে না। এমন অবস্থায় মেয়েটি আস্তে-আস্তে অবদমিত মানসিক অবস্থায় চলে আসে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটি উপায়—বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান। মেয়েটি আবার ছেড়ে আসা ধনি পরিবারে ফিরে আসলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ঃ কিশোর বা বাচ্চারাও ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটাতে পারে কি?

প্রবীর ঘোষ ঃ কেউ যদি বাড়িতে দুষ্টুমি করে ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাহলে সে অবশ্যই বালক বা কিশোর। মা-বাবার কড়া শাসন থেকে অব্যাহতি পেতে ভূত আমদানি করে।

ঈর্ষা, হতাশা, অবদমিত আবেগ, ক্রোধ, শ্রদ্ধাহীনতা ইত্যাদি থেকে ভুতুড়ে ঘটনার সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় মা-বাবার উচিৎ ভালোবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে সন্তানের পাশে দাঁড়ান।

প্রশ্ন ঃ কোনও স্কুল বা এলাকাতে ভুতুড়ে ঘটনা ঘটতে পারে। তখন সত্যানুসন্ধান কিভাবে করবো?

প্রবীর ঘোষ ঃ কোনও স্কুল বা এলাকাতে যদি পর-পর সবাই ভূত দেখতে থাকে অথবা অনেকের ভূতে ভর হতে থাকে তাহলে তাকে মাস-হিস্টিরিয়া বলে। অর্থাৎ বহুজনের মধ্যে হিস্টিরিয়ার প্রকোপ। এমন অবস্থায় ঐ স্কুলে বা এলাকাতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করা। ওঝা-তান্ত্রিককে চ্যালেঞ্জ জানান। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এলাকার সব বয়সি মানুষের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে ভূত বলে কিছুই নেই। ঠিকঠাক বোঝাতে পারলে মাস-হিস্টিরিয়া শেষ হয়ে যাবে। এই কাজে পুলিস-প্রশাসন এবং মনোরোগ চিকিৎসক ও মনোবিদ-এর পরামর্শ ও সাহায্য নিতে পারলে ভালো হয়।

প্রশ্ন ঃ মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা ভূত তাড়াবো কি উপায়ে?

প্রবীর ঘোষ ঃ ভূত বাসা বাঁধে আমাদের মনের অন্ধকারে। সেখানে জ্ঞানের আলো আনলেই ভূতেরা পালায়, ভূতেরা মারা যায়। অজ্ঞানতা আনে ভয়, দেয় ভূতের জন্ম। জ্ঞান আনে সাহস, ঘটায় ভূতের মৃত্যু। ভূত কোনওদিনই ছিল না, নেই এবং থাকবেও না। আপনার মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে, ভূত এবং ভূতে ভর ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত জানতে অবশ্যই আমার লেখা বই 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' (দ্বিতীয় খণ্ড) পড়ুন এবং পড়ান। এর পরেও যদি আপনার মনে ভূত নিয়ে কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র কাছে আসুন। যুক্তিবাদী সমিতি আপনার মনের ভূতের মৃত্যু অবশ্যই ঘটাবে। আর শেষ প্রশ্ন, যদি কেউ ভূতের প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তাকে আমি ৫০ লক্ষ টাকা প্রণামি দেবো। চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি আছেন তো?

আত্মা মানে মন। ভূত মানে বিদেহি আত্মা। কারণ বহু ধর্মে বিশ্বাস করে, আত্মা ছিল, আছে ও থাকবে।

হিন্দুধর্মে বলা আছে, আত্মা মানে চিন্তা, চেতনা বা মন (মরণের পারে : স্বামী অভেদানন্দ)।

এখন পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা জানে—মন হল মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের কাজ-কর্মের ফল। মানুষ মারা গেলে মস্তিষ্কস্নায়ুকোষ মারা যায়। সুতরাং তার একমাত্র আত্মাও মারা যায়।

আত্মা না থাকলে ভূত আসবে কোথা থেকে।

নিমগাছে ত্রিচক্ষু রহস্য

সন্তোষ শর্মা

সময়টা মে মাস। সাল ২০০২। হৈ হৈ কাণ্ড শোভাবাজারে। একটি নিমগাছে মা শীতলার তিনটি চোখ গজিয়েছে। গাছে ত্রিচক্ষু দেখতে ভক্তের প্রচণ্ড ভিড় রাস্তায়। রাস্তায় লাগিয়ে দেওয়া হল 'নো-এন্ট্রি' বোর্ড। নিমগাছে ত্রিচক্ষু রহস্যের খবরটি সীমা বসাক প্রবীর ঘোষকে দিলেন। সে শোভাবাজারে থাকে। যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য।

এই খবরটি পেয়ে প্রবীর ঘোষ ফোন করলেন 'খোঁজখবর'-এর এঙ্কার অনিকেত চট্টোপাধ্যায়কে। এরপর প্রবীর ঘোষ, অনিকেত এবং এক ক্যামেরাম্যান তিনজনে হাজির হলেন শোভাবাজারে। ভক্তদের ভিড়ে রাস্তায় 'নো এন্ট্রি' বোর্ড ঝোলান। প্রচুর পুলিস। তার চেয়েও বেশি উৎসাহিত দর্শক। 'প্রেস' লেখা গাড়ি দেখে পুলিস প্রবীর ঘোষ এবং সাংবাদিকদের গাড়ি ঢুকতে দিলেন। প্রবীর ঘোষ ভিতরে ঢুকে দেখলে, ''নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এলাকা। নিমগাছটি একটা বাড়ির চত্বরে। আর গাছে তিনটি রুপোর চোখ!

একটুক্ষণ আগে ভর থেমেছে। একসঙ্গে অনেকের ভর হয়েছিল। ভর হওয়া মানুষদের সঙ্গে প্রবীর ঘোষ কথা বললেন। এরপর এক মহিলার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে প্রবীর ঘোষ বললেন, ''তোমার ভর হচ্ছে। তোমার ভর হচ্ছে। তোমার উপর মা শীতলার ভর হচ্ছে...।" মিনিট দুই-এর মধ্যে ঐ মহিলা মাথা দোলাতে লাগল। চুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মাথা ঘোরাতে লাগল।

প্রবীর ঘোষ নিমগাছে গজিয়ে ওঠা চোখগুলোতে হাত যেই দিতে যাচ্ছেন, তখনই লোকেরা হৈ-হৈ করতে লাগলো, ''হাত দেবেন না। চোখগুলো জ্যান্ত। নিজেই হয়েছে।"

প্রবীর ঘোষ বললেন, ''আমি তান্ত্রিক। শীতলা আমাকে ভালোমতন জানেন। আমার কিছু হবে না।"

ভরগৃহস্থদের দেখে দর্শকের মনে হল, ''প্রবীর ঘোষ কোনও বড় মাপের তান্ত্রিক। গলায় বড় মালা ও গায়ে কালো ঝুল পাঞ্জাবি।"

এরপর প্রবীর ঘোষ বললেন, ''মা শীতলা খুশি হয়ে গেছেন। তোমাদের আর ভর হবে না। তোমরা এবার নিশ্চিন্তে থাকো।"

এরপর তিনটি চোখ নিমগাছ থেকে তুলে নিলেন গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন বলে। কিন্তু গঙ্গায় বিসর্জন না দিয়ে তিনি চোখগুলো নিজের কাছে রেখে দিলেন।

ঐ চোখগুলো তুলেই দেখা গেলো, ধুনোর আঠা দিয়ে চোখগুলো গাছে লাগানো হয়েছিল। কোনও দুষ্টুলোক পয়সা রোজগারের ধান্দায় একাজ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ নিমগাছে মা শীতলার ত্রিচক্ষু রহস্য উন্মোচন করলেন। লোক ঠকানোর ফন্দি লাটে উঠে গেলো।

সেক্যুলারিজম : মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ

যতীন সরকার

মধ্যযুগের অনেক সংসার বিবাগী সন্ত ও লোকসমাজের মরমি কবি, আকবর দারা শিকোহর মত সম্রাট ও সম্রাট পুত্র, আধুনিক কালের মানবতাবাদী মনীষীবৃন্দ রিলিজিয়ন অনুসারী অনেক উদারপ্রাণ মানুষ—এরকম সকলের প্রয়াস রিলিজিয়নকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাখতে চেয়েছে, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। কোথাও কোথাও সে প্রত্যয় শক্তিশালী সাংগঠনিক রূপও ধারণ করেছে, নিরীশ্বরবাদী সমাজ বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঈশ্বর-বিশ্বাসী রিলিজিয়ন অনুসারীদের সহযোগ ঘটিয়েছে।

কিন্তু দুঃখ এই রিলিজিয়নকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে রাখার এরকম সব শুভ কামনা ও মহৎ প্রয়াস সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবী আজও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি, বিদ্বেষ ও সংঘাতমুক্ত মানবসমাজ গড়ে ওঠে নি। ঘটেছে ও ঘটছে বরং তার বিপরীত সব ঘটনা। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে উপমহাদেশের রাষ্ট্রবিভাজন সংঘটিত হয়েছে, শতাব্দীর শেষলগ্নে মসজিদ-মন্দির তথা রিলিজিয়নের বহিরঙ্গ নিয়ে রাজনীতির আসর সরগরম হয়ে উঠেছে, অনৈক্য ও বিভেদ প্রতিনিয়তই ঐক্য ও সংহতির শক্তিকে পরাস্ত করে চলছে। শুধু উপমহাদেশে নয়, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই রিলিজিয়নকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার আরো জঘন্য চেহারা প্রকটিত হচ্ছে। একালে যা মৌলবাদ নামে পরিচিত তা তো সাম্প্রদায়িকতারই চূড়ান্ত ও বিকৃত রূপ। উপমহাদেশের দেশগুলোতে, ইরানে, আফগানিস্তানে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশে, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ প্রতীচ্যেও, মৌলবাদের অশুভ অপচ্ছায়া পড়ছে। মৌলবাদ মানবসভ্যতার চাকাটিকে মধ্যযুগের দিকে ফিরিয়ে দেবার অপপ্রয়াসে মেতেছে। সেই অপপ্রয়াস সফল করতে চাইছে রাষ্ট্রশক্তিকে গ্রাস করে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর তার অশুভ থাবা বিস্তার করে।

অথচ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মৌলবাদ কেন, রিলিজিয়নের সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ রিলিজিয়ন মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণের কথা বললেও ইহলোকের সীমানা ছাড়িয়ে পরলোকের পথেই তার অভিযাত্রা, তাকে কোনো ভৌগোলিক সীমাতেই আটকে রাখা যায় না। সকল রিলিজিয়নই রাষ্ট্র-নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসী মানুষের অতিপ্রাকৃত ভাবনার ধারক। রিলিজিয়ন তার অনুসারীদের পারলৌকিক শাস্তির বিধান দেয়, কোন ধরনের বিশ্বাস বা আচরণের জন্য পরলোকে শাস্তি পেতে হবে তাও বলে দেয়। অন্যদিকে রাষ্ট্র বিষয়টাই একান্ত ইহলৌকিক ও বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ। রাষ্ট্রের কাজ তার নাগরিকদের ইহলৌকিক

কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কারো পরলোকের শান্তি বা শাস্তি বিধানের বিষয়টি তার ক্ষমতাবহির্ভূত। রাষ্ট্র ও রিলিজিয়নের এরকম বৈপরীত্যের জন্যই রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব চরিত্র রক্ষার জন্য যেমন রিলিজিয়ন নিরপেক্ষ হতে হয়, তেমনি রিলিজিয়নও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হয়েই তার চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারে। যারা রাষ্ট্রকে রিলিজিয়নের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে তারা রাষ্ট্র ও রিলিজিয়ন উভয়েরই চরিত্র হনন করে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে এ-রকমই একটি চরিত্রহীন ও চরিত্রহননকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে-রাষ্ট্রটি কপালে রিলিজিয়নের ছাপ মেরে অর্থাৎ পবিত্র ইসলামের সঙ্গে রাষ্ট্র নামটিকে যুক্ত করে—সকল প্রকার অপবিত্র, অমানবিক তথা মানবধর্ম-বিরোধী অনাচার চালিয়ে যায়, শোষণে, উৎপীড়নে, সাম্প্রদায়িক নিপীড়নে ধনবৈষম্যে ও আঞ্চলিক বৈষম্যে রাষ্ট্রের নাগরিকদের দুঃখজর্জর করে তোলে। আমরা—সেকালের পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা—চব্বিশ বছর ধরে সংগ্রাম করে অপরিমেয় রক্তের বিনিময়ে ওই অমানবিক রাষ্ট্রযন্ত্রটির কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিলাম। এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবেই আমাদের নব-অর্জিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে পাকিস্তানের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিষিক্ত করেছিলাম, আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি রূপে সেক্যুলারিজমের স্থান দিয়েছিলাম। এ-রাষ্ট্রে রিলিজিয়নভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের কোন অধিকার থাকে না, রাষ্ট্রকর্মে বা রাজনীতিতে রিলিজিয়নের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এভাবে একটি আধুনিক সভ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়েই আমাদের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল।

কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই অভ্যুত্থান, হত্যা ও প্রতারণার পথ বেয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি যাদের দখলে এল তাদের হাতে সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজম লোপাট হয়ে গেল।

মানবধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ তো রুদ্ধ হলই, পাকিস্তানে যে রকমটি ছিল সে রকমই রিলিজিয়নকেও রাষ্ট্রীয়করণ করে তারও চূড়ান্ত অবমাননা করা হল, রিলিজিয়নভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে পাকিস্তানের অপচ্ছায়া বিস্তারের সুযোগ করে দেয়া হল। আর তারই ফলে বিবেকের স্বাধীনতা হারাল দেশের সকল মানুষ। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা। রাজনীতিতে রিলিজিয়ন-ব্যবসায়ীরা প্রবল প্রতাপের অধিকারী হয়ে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের অনুসারী সকল কবি-শিল্পী-পণ্ডিতের নামের সঙ্গে ধর্মবিরোধী, কাফের ও মুরতাদ-এর ছাপ মেরে দিল, তাঁদের ফাঁসি দাবি করল, তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলল। সবশেষে ওরা 'ব্লাসফেমি আইন' নামক একটি অসভ্য বিধান প্রবর্তনের কোলাহল তুলে দেশটিকে মধ্যযুগের অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে চলল। অর্থাৎ প্রগতির রথে চড়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ নামক যে স্বাধীন রাষ্ট্রটির, অল্পদিন পরেই সেটির জন্য এল উল্টো রথের পালা।

এ-পালা ঘুচিয়ে একে তার সঠিক স্থানে প্রতিস্থাপিত করার অর্থাৎ সেক্যুলারিজম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বই বর্তেছে এ রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিকদের ওপর। সে দায়িত্ব পালন করার জন্য সেক্যুলারিজম সম্পর্কীয় ধারণাটিকেই স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন প্রথমে। কারণ আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির প্রথম সংবিধানে সেক্যুলারিজম সংযোজিত

হলেও এর তাৎপর্য এ দেশে এর প্রবক্তাদেরও সকলে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। সেক্যুলারিজমের বাংলা করা হল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। 'ধর্ম' শব্দ দিয়ে যেমন 'রিলিজিয়ন'-এর অর্থবিভ্রাট ঘটে, তেমনি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সেক্যুলারিজম' সম্পর্কে বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে। বাংলায় ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত যে অর্থ আমরা পেয়েছি তাতে তো কোনো মানুষই 'ধর্মনিরপেক্ষ' হতে পারে না, 'ধর্মহীন' তো নয়ই। মনুষ্যত্বই যেহেতু মানুষের ধর্ম তাই ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ হলে কিংবা ধর্মহীন হলে মানুষ তো আর মানুষই থাকে না। কাজেই, এ-অর্থে মানুষের রাষ্ট্রও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না, সে-রকম রাষ্ট্র মানুষের বসবাসেরই উপযুক্ত থাকে না। উদাহরণ—ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রসমূহ।

আসলে অন্য সবকিছুর মত রাষ্ট্রেরও নিজস্ব ধর্ম আছে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী, তার শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি যা কিছু নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় অর্থাৎ যা রাষ্ট্রকে ধারণ করে, তাই রাষ্ট্রের ধর্ম। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের যা ইহলৌকিক কল্যাণ সাধন করে তা-ই সেক্যুলারিজম, এই সেক্যুলারিজমই রাষ্ট্রের ধর্ম।

অথচ, আমাদের ভাষায় ধর্ম শব্দটির মূল অর্থ ও রিলিজিয়ন বোঝাতে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে এক ধরনের অর্থবিভ্রান্তি আছে বলেই, রিলিজিয়ন-বিশ্বাসী সরল মানুষদের কেউ কেউ 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের সেই আতঙ্কে সুড়সুড়ি লাগায় ধর্ম-ব্যবসায়ী (আসলে রিলিজিয়ন-ব্যবসায়ী) রাজনীতিকরা। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটা ভয়াবহ রূপ তুলে ধরে, এ-রকম রাষ্ট্রে মানুষ কোন 'ধর্মকর্ম' করতে পারবে না বলে তার স্বরে প্রচার করে এবং এ-রকম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সকলকে প্ররোচিত করে তোলে। আর তারই মোকাবেলায় আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিকরা বারবার বলতে থাকেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়'। কিন্তু এতে বিভ্রান্তির নিরসন হয় না, বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ আরো বাড়ে বরং। তাই, এ-ধরনের নেতিবাচক কথার বদলে সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রকৃত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যই জনগণের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা দরকার।

বলা দরকার, 'ধর্ম' শব্দটির মূল অর্থের বিচারে সেক্যুলার রাষ্ট্র ধর্মহীন নয় মোটেই, মানুষের ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা দানই এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। আবার, ধর্ম বলতে যখন রিলিজিয়ন বোঝায়, তখনো রিলিজিয়ন-বিশ্বাসীর বিশ্বাসপোষণ ও আচার-আচরণ পালনের নিশ্চয়তা একমাত্র সেক্যুলার রাষ্ট্রই দিতে পারে। যে-রাষ্ট্র সেক্যুলার নয়, সে-রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কাছ থেকে সে-রকম নিশ্চয়তা কেড়ে নেয়। সে-রাষ্ট্র কোনো একটা বিশেষ রিলিজিয়নকেই সুয়োরানি বানায়। অন্য রিলিজিয়নগুলোকে দলন যদি নাও করে, মর্যাদার দিক দিয়ে সেগুলোর হয় নিতান্তই হীনদশা। সে-রাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রধর্ম' নামে ঘোষিত রিলিজিয়নটি ছাড়া অন্য রিলিজিয়নের অবস্থা হয় রূপকথার রাজার সেই দুয়োরানিটির মত, ঘুঁটে কুড়ানি দাসীর জীবনযাপনই হয় তার অনিবার্য নিয়তি। অথচ, সেক্যুলার রাষ্ট্রের কাছে কোনো রিলিজিয়নই দুয়োরানির অবজ্ঞা যেমন পায় না, তেমনি সে-রাষ্ট্র কোনো রিলিজিয়নকেই সুয়োরানি বানিয়ে মাথায় তুলেও নাচে না।

তবে, সেক্যুলার রাষ্ট্র সম্পর্কে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। কারণ সেক্যুলার রাষ্ট্র সকল রিলিজিয়নের অধিকারেরই যেমন স্বীকৃতি ও নিশ্চিতি দেয়, তেমনি কোনো রিলিজিয়নেই যার বিশ্বাস নেই সে রকম তথাকথিত 'ধর্মহীন' মানুষের

অধিকারেরও স্বীকৃতি ও নিশ্চিতি সে-রাষ্ট্রকে অবশ্যই দিতে হয়। সে-রাষ্ট্র কোনো রিলিজিয়নের প্রতিই সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না, কোনো রিলিজিয়নদের প্রচার-প্রসারে ব্যথাও দেবে না, সব রিলিজিয়নেরই চর্চা ও অনুসরণ যাতে বাধামুক্ত হতে পারে তারও ব্যবস্থা করে দেবে। আবার রিলিজিয়ন নিয়ে মুক্তভাবে কথা বলার ও লেখার অধিকারও সে-রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। সে-রাষ্ট্রের নাগরিকদের যে-কোনো রিলিজিয়নই মানবার অধিকার থাকবে, নিজের বিবেকের নির্দেশমত এক রিলিজিয়ন ছেড়ে অন্য রিলিজিয়ন গ্রহণ করারও অধিকার থাকবে এবং থাকবে কোনো রিলিজিয়নই না-মানবার অধিকারও। আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, একেশ্বরবাদী, বহু ঈশ্বরবাদী—সকলেরই নিজ নিজ বিশ্বাস পোষণের ও প্রচারের থাকবে অবাধ অধিকার। কেবল একটি অধিকারই কেউ পারে না, সেটি হচ্ছে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার।

অন্য সকল মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি নাগরিকের বিবেকের অধিকারের সুরক্ষাই হবে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব। বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর ('It shall be the duty of every citizen of Indian to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform') যে নাগরিক দায়িত্বের কথা ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে, প্রতিটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। সেক্যুলার রাষ্ট্রই আধুনিক সভ্য রাষ্ট্র।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীদের অবস্থান এ-রকম আধুনিকতা ও সভ্যতারই বিরুদ্ধে। তারা কোনো একটা বিশেষ রিলিজিয়নের অনুশাসনকেই রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। কোনো রাষ্ট্র যদি কোনো একটি বিশেষ রিলিজিয়নকে রাষ্ট্র নামের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়, তবে সেই বিশেষ রিলিজিয়নটি ছাড়া অন্য সকল রিলিজিয়নের অনুসারী মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবেই হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় রিলিজিয়নটির দিগন্তও সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যায়, সে-রিলিজিয়নের বিভিন্ন ভাষ্যকে অবদমিত করে একটি বিশেষ ভাষ্যকে মানাই সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে তোলা হয়। রাষ্ট্রের এ-রকম হস্তক্ষেপে রিলিজিয়নের মর্যাদা তো বাড়েই না, বরং তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তার চরম অবমাননা ঘটে। এ-রকম তথাকথিত 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' বা 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' মানুষ ও মনুষ্যত্বকেই অবমানিত করে, মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার গতিপ্রবাহকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। এ-রকম সমাজ ও রাষ্ট্রকে কি সভ্যসমাজ ও সভ্য রাষ্ট্র বলা যায়?

সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীদের পরিকল্পিত এ-রকম অসভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব মাথায় তুলে না নিলে সভ্যতার সংকট মোচন হবে না কিছুতেই। এ-সংগ্রাম অবশ্যই রিলিজিয়নের বিরুদ্ধে নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী সমাজ-দার্শনিক তো বলেই দিয়েছেন যে, 'রিলিজিয়ন হচ্ছে মানবমনে প্রতিফলিত বাস্তবের উদ্ভট প্রতিচ্ছায়া'। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায় কোন মূর্খ? সংগ্রাম চলবে তাদেরই বিরুদ্ধে রিলিজিয়নের নামে যারা মানুষের সামনে থেকে বাস্তব অনুধারণার প্রকৃত পথটিকে আড়াল করে রেখেছে, মানুষকে যারা মানবধর্ম পালনের সুযোগ বঞ্চিত করেছে।

এ-সংগ্রাম প্রকৃত ধর্মপ্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম।

কুউউক

আপতার

করিম বড় ধার্মিক ছেলে। তার বয়স অল্প। এইমাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সে দেখে দাদির কাছে পাড়ার ছেলে মেয়েরা পড়তে এসেছে। কেউ কায়দা, কেউ আম্মাপারা, কেউ বা কোরান শরীফ। কারো মাথায় ওড়না, কারো মাথায় টুপি। এইমাত্র যারা চেঁচামেচি করতে করতে কেউ গজি, কেউ বউমারি, কেউ আপ্পাদুল, কেউ চোর পুলিশ খেলছিল। তাদের মুখে ছিল জয়ের ঝিলিক। কেউ গজি দেওয়ার জন্য ছুটছে, কেউ বউকে মারার জন্য। কেউ গাছে উঠে ঠ্যাং দোলাচ্ছে, আবার কেউ চোরকে 'কুক' দিচ্ছে। এখানে কেউ হারছে, কেউবা জিতছে। অথচ অবাক করা বিষয়—সবাই আনন্দে মশগুল। কিন্তু এখন সবাই শান্ত। সবাই আল্লার কালাম পড়ছে, নুর পড়ছে। করিম কায়দা পড়ে আর বাকিদের পড়া দেখে। দাদির সুমিষ্ট বচনে সবাই পড়তে থাকে। দাদি মাঝে মাঝে বলে—'আল্লার পড়া পড়তে পড়তে কেউ বদমাশি করো না। তোমাদের দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা আছে। তারা মনকির ও নকির। তোমাদের সব ভালো কাজ ও খারাপ কাজ লিখে রাখে। কেয়ামতের দিন বিচার হবে। কেউ ছাড় পাবে না। সাবধান। মাটিতে পা-ও সাবধানে ফেলবে। নাহলে গোরে আজাব হবে। দুই দিকের মাটি কবরের মধ্যে পিষে ফেলবে'।

সবার চোখ দাদির দিকে স্থির। পড়া শেষ হয়ে যায়। সবাই যে যার বাড়ি চলে যায়। পড়ার রেস তবুও থেকে যায়। যখন দাদি পান চিবোতে চিবোতে করিমের মুখেও একটু গুঁজে দেয়। করিম হাত দিয়ে বাধা দেয়। হ্যাঁ, যে করিম দাদির মুখের পান খাওয়ার জন্য সর্বদা কান্না জুড়ে, সে এখন বাধা দেয়। আর দাদিকে জিজ্ঞেস করে—'আচ্ছা দাদি, একটা উত্তর দাও তো, আমার তো বয়স সাত, আমি যদি বাকি তিরানব্বই বছর আর কোন গুনার কাজ না করি, তাহলে কি আমার কবরের আজাব মাপ হয়ে যাবে। আমি জানিনা আমি কি কি গুনা করেছি, আমার কি সব গুনা মাপ হবে না দাদি?' তখন দাদি করিমকে বুকে টেনে কপালে চুমু খায়। করিম তখন কপাল থেকে পানের দাগ মুছতে মুছতে দাদির কথা শোনে—'হ্যাঁরে দাদু, আল্লার কাজ করলে সব গুনা মাফ হয়ে যায়, তুই জান্নাত পাবি'।

এর পর করিম ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। সে রোজা রাখে, না রাখতে পারলে দুপুরে খেয়ে নেয়। দাদি বলে 'ওতে গুনা হবে না। ওটা তোমাদের হাফ রোজা'। এভাবে করিম আল্লার এবাদাত করতে থাকে, স্কুল ফাঁকি দিয়ে সে জুম্মার নামাজ

পড়তে যায়। সবেবরাতের রাতে সারা রাত এবাদত। কারণ এটিই ভাগ্য পরিবর্তনের রাত। যতই ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন করিম টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ধোয়া পাঞ্জাবি টুপি পরে কাকার সঙ্গে মসজিদে যায়। প্রথমে মসজিদে নামাজ পড়ে তারপর হারকিন লাইট মাথায় করে সবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কবর যিয়ারতে। সে হয়ত তাদের কাউকে দেখেনি কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে যত কবরস্থান আছে সব যিয়ারত করে, সব মৃত মানুষের শান্তি কামনা করে, তারপর আবার সবাই মসজিদে এসে নামাজ পড়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত। কেবল মুসলিম নয় করিম সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। কারণ সে মনে করে সবাই আল্লার সন্তান।

করিম সবসময় দাদির সঙ্গী। যখন কারো পেটে ব্যথা হয়, তখন দাদির কাছে জল পড়াতে আসে। করিম পাশে বসে দাদির হাইতোলা দেখে। দাদি বলে হাই ওঠা মানে কারো নজর লেগেছে। আবার কাউকে ভূতে ধরে, সেখানেও করিম দাদির সঙ্গে হাজির। দাদি সরসা-লংকা পুড়িয়ে ভূতে ধরা ব্যক্তির চুলমুঠো ধরে ভূত তাড়াতে ব্যস্ত। ভুত তখন বাপবাপ বলে পালাতে চায়। কিন্তু দাদি এত সহজে ভূতকে যেতে দেবে না। হয় সিল কিংবা জুতো মুখে নিয়ে যেতে হবে, নাকখত করে যেতে হবে, ঝাঁটার মার খেতে খেতে যেতে হবে। আর বলে যেতে হবে সে আর যেন এমুখো না হয়। করিমের কাছে এসব দৃশ্য বেশ মজার। অবশ্য করিমের মা ভয় পেয়ে গুরামোল্লার কাছ থেকে তাবিজ এনে দেয়। বালক করিম অভ্যাস বশত চারিদিকে ছুটতে ছুটতে কখনো হাসপাতালেও পৌঁছে যায়। মা তখন রেগে আগুন। পয়সা খরচা করে তাবিজ এনে দিল আর সে হাসপাতালে গিয়ে মার খাওয়াল। মা বলে হাসপাতাল, ছুতঘর এসবে গেলে তাবিজ তার ক্রিয়াশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তাবিজের ভিতরের লেখা মুছে যায়। তার মধ্যে কৌতূহল জাগে। সে দা নিয়ে তাবিজকে কাটতে বসে, দেখতে পায় লেখা মুছে যায়নি। সে তখন আনন্দে আত্মহারা, সে মায়ের কাছে নৌড়ে ছুটে আসে তার নতুন আবিষ্কার জানানোর জন্য। উৎফুল্ল কণ্ঠে তখন শোনা যায় 'মা তাবিজ মার খায়নি, আল্লার কোরান সবথেকে বড়, সে কারো কাছে মার খেতে পারে না। দেখো, লেখা মুছে যায়নি'। করিমের জীবনে আরও নানা অভিজ্ঞতা এসে মেশে। কাকা অসুস্থ। এক মৌলবি আসে। সে কাঠকয়লায় জল ছিটে আগুন ধরায়, সুপুরির উপর পিঁড়ি রেখে ঘরের লোককে বসায় তারা প্রত্যেকে মোল্লার কথার শক্তিতে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। শেষে সুস্বাদু তেঁতুল গাছ কেটে ঘরবন্ধ দিয়ে যায়। নানা অলৌকিক ক্রিয়া করম দেখে সবার মন আল্লারা স্মরণে অংশ নেয়।

এই করিম মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যায়, সকাল সকাল মসজিদে নামাজ পড়ে বেরিয়ে পড়ে আল্লার নাম নিয়ে। মৌলবি সাহেব তাকে কোরানের আয়াত লিখে দিয়েছে এডমিট কার্ড এর সঙ্গে রেখে দিতে আর প্রশ্ন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করতে। করিম 'বিসমিল্লা' লিখে শুরু করে জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে নূরানি-প্রেমে ভর্তি হয় মাদ্রাসায়, আল্লার নূরানি কোরান পাঠের উদ্দেশ্যে।

কেবল আরবি কোরান নয়, সে এখন মাতৃভাষায় বার বার কোরান পড়তে থাকে। সে মুগ্ধ হতে থাকে। অনুভব করতে থাকে মানুষকে, পৃথিবীকে, আর তার স্রষ্টা কর্তাকে, কখনো অবাকও হয়, সন্দেহ জাগে, তবে ক্ষণিকের জন্যই, তার নরম হৃদয়ে অনুভব করে আল্লা যখন বলছেন তখন ঠিকই বলছেন। কারণ ঈশন দৃঢ় রাখতে হয়, না হলে জান্নাতুল ফিরদৌস পাওয়া যাবে না। ক্রমে ধর্মগ্রন্থের সাথে সাথে স্কুলের পড়াশোনার প্রতিও তার ইচ্ছে বাড়তে লাগল। সে প্রাইভেট টিউশান নিতে চায়। দাদি পয়সা জোগাড় করে তাকে পড়তে পাঠায়। সে স্বপ্ন দেখে সেও একদিন চাকরি পাবে। তখন দাদির সমস্ত স্বপ্ন পূর্ণ করবে। এ বিশ্বে অনেক কিছু আছে দেখার। সে সব তার দাদিকে দেখাবে। করিম তার বাবাকে ভালবাসলেও একটু রাগ করে। কারণ মাথাকে কোরান বললেও তার বাবা মায়ের মাথায় লাথি মারে, ছোলায় নুন না মাখানোর জন্য রোযা খোলার সময় সমস্ত খাবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এজন্য আল্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে করিমের দয়ালু মন। বাবার যেন আখেরাতে শাস্তি না হয়। কিন্তু...

আজ করিম আল্লার কাছে হাত তুলছে না। তার জীবনের সবথেকে প্রিয় তার দাদি অসুস্থ। বিগত কয়েক বছর থেকে শয্যাশায়ী। ডাক্তারের সামর্থ নেই সুস্থ করার, রোগীর সামর্থ নেই উঠে দাঁড়ানোর, পরিবারের সামর্থ নেই সেবা করার। রোগীর কান্নায় একটাই সুর—'আমার মুখে বিষ দাও, আল্লা আমাকে মাউত দাও'।

গ্রাম ছাড়া করিম কলকাতা থেকে বাড়ি আসছে। সরকার অনুমদিত চিটফান্ড কোম্পানিকে সরকারই হড়কে দিয়েছে। তার মত অবস্থাই সহ্য করতে না পেরে এক বন্ধু আত্মহত্যা করেছে। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে মোল্লার উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি—'মিনহা খালাকনাকুম...' সে তো সৃষ্টি করেনি কাউকে, তাহলে সে কীভাবে এটা বলবে? মাটি দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল করিম। কিছু একটা ভুল হচ্ছে, করিমের মাথার ভেতর তালগোল পাকাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না। যখন সবাই মাটি দিয়ে সরে পড়েছে তখন করিম কোন নীয়ত উচ্চারণ না করেই মাটি দিয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল পেছন দিক থেকে কেউ যেন ডাকছে। করিম তার মৃত বন্ধুর নাম ধরে ডেকে উঠল। না কেউ নেই। সে ভূতের ভয় পেল। আল্লার নাম স্মরণ নিতে লাগল। তবুও ভয় কমল না। তখন করিম পাগলের মতই বলে উঠল—'কোন শালা শুয়ারের বাচ্চা সাহস থাকলে সামনে দেখা দে...' করিমের শ্বাসপ্রশ্বাস যেন ক্রমশ ধীরে, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে লাগল। এভাবে কতক্ষণ কাটল করিমও যেন বুঝতে পারল না। আবার করিম যেন অসম্ভব এক জীবনীশক্তি পেল, হাসতে লাগল—'ভূত হোক, পেত্নী হোক, খাব্বিস হোক কিংবা জক্কা তোকে গাল দেওয়া বৃথা' করিম আবার পাগলের মত হাসতে হাসতে বলল—'অস্তিত্ব থাকলে তো আসবি'। যে যেন কোন এক সূত্র খুঁজে পাচ্ছে। যেখানে আনাগোনা দেয় মোল্লার কেরামতি কিংবা বাপের দ্বিচারিতা। অথচ বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সব অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল। দাদির

কান্না ধ্বনি শুনতে শুনতে সে কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল, সেহেরীর খাবারের ডাক। আজ শবেবরাত। তাই রোযা রাখতে হবে। খাওয়ার পর আর ঘুম আসেনি। কোন দিন আসবে কিনা তাও জানে না। আবার তার মাথা ভার হয়ে আসছে, সে রোজার নিয়াত করতে পারছে না—'নাওয়াইতু আন আছুমা গাদিম.../আমি আগামী কালের জন্য রোযা রাখার নীয়ত করলাম' আজ রাখবে রোযা আর নীয়ত কালকের? কেন? করিম কোন উত্তর পেল না। কেমন যেন একটা অবশ করা মুহূর্ত অতিক্রান্ত হতে লাগল। চিৎকারে চেতনা এল করিমের। একদিকে দাদির ক্রন্দন অপরদিকে বাড়ির লোকের অতিষ্ঠ চিৎকার। করিম ধীরে ধীরে দাদির কাছে উঠে গেল। বিগলিত হৃদয়ের করুণা মাখান করুণ স্পর্শে দাদিকে একবার জড়িয়ে ধরল। এমন সময় আজান শোনা গেল। করিম উজু করে নামাজে দাঁড়াল। নীয়ত করা তার এবার হল, নামাজ পড়তে পারল না। ফাতিহার সুরাতেই তার মনে হল—'আলহামদো লিল্লাহে.../ শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় এবং দয়ালু...'। এ নাহয় না বুঝেই উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু যে আল্লাহ শুনবে, তারও তো একটা লজ্জাবোধ থাকা উচিৎ। গভীর স্তব্ধতা ভেঙ্গে কাঁধের ফেরেশতা যেন বলে উঠল—'লজ্জা তো তার থাকে যার অস্তিত্ব...'। হোক এই শোষিত সরকার কিংবা নিপীড়িত জনগণ, হোক তার মৃত বন্ধু, কিংবা মৃত্যু কাঙ্ক্ষিনী দাদি—এদের স্রষ্টা আল্লা হতে পারে না। করিম বেরিয়ে পড়েছে। স্বপ্নের গ্রাম ছেড়ে। সাধের স্বপ্ন ছেড়ে। তার এখন অনেক কাজ বাকি। মরীচিকার বাহির থেকে জীবনের অন্দরে প্রবেশ করতে হবে। পূর্ব আকাশে তখনো সূর্য দেখা যায়নি। সোনালি আলো যেন 'কুক' দিচ্ছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশান-এর বার্ষিক সম্মেলন ৩ ও ৪ মার্চ ২০১৮

স্থান – দেবী কমপ্লেক্স কমিউনিটি হল (মতিঝিল-এর বিপরীতে)

দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪

ডেলিগেট ফি – ৫০০ টাকা। সময় – সকাল ৯ টায়

যোগাযোগ : প্রবীর ঘোষ - 9330121900

মনীশ - 8100814180

আপতার - 9593003380

থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

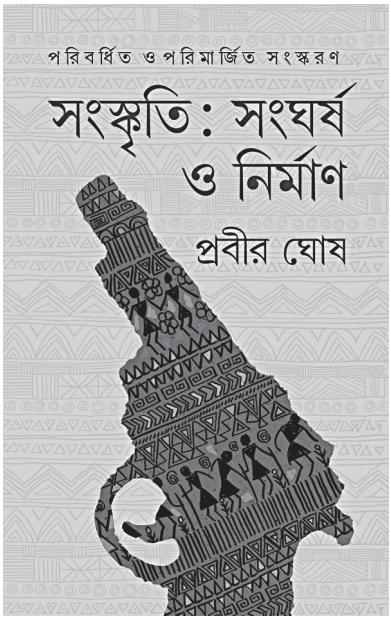

শুরুতেই গোড়ার কথা বলে নিতে চাই। এই গ্রন্থটিকে এক কথায় বলা যায় 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র manifesto, অর্থাৎ সংগঠনটির কর্মসূচি, মতামত, উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

ঢাকঢোল না পিটিয়েও একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে চলেছে ভারতে। এ-দেশের ৬৭৫টি জেলার মধ্যে প্রায় ৩০০ টি জেলায় স্বয়ম্ভর গ্রাম বা স্বরাজ বা সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে কৃষি অঞ্চল, বনভূমি, খনি অঞ্চল, জলাভূমি, চা-বাগিচা এ-সব।

এটা তো শাসক-শোষকদের সর্বনাশ। তারপরও এগুলো গড়ে উঠল কী করে?

শোষণমুক্ত সাম্যের একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে এই গ্রন্থটিকে আত্মীকরণ করা।

স্টাডি ক্লাশের সময়

প্রতি রবিবার, ৪টা থেকে ৬টা, দেবীকমপ্লেক্স, ব্লক-'সি', ফ্যাট ১০৪, কলকাতা-৭৪।

প্রধান সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ। সম্পাদক : মণীশ, আপতার, জয়দেব
ঠিকানা : ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৬০-৫১১১
● e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com ●
website : www.humanistassociation.org, www.srai.org
কলকাতা অফিস : ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

বইমেলা সংখ্যা | জানুয়ারি ২০১৮ | দাম : ২৫ টাকা

সুফী মতবাদ ও উদারতা

সাম্যের পথে

কুউউক

ভূতের গ্রামে স্টার আনন্দ

দারিদ্র্য দূরীকরণ

বিজ্ঞানে বিশ্বাস এবং...

ভূত পোষার শাস্তি